

ছবি ও ছড়ায়

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য

ছবি ও ছড়ায়

দ্বিতীয় ভাগ

[দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য পাঠ্য]

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. বি. টি.

এমেরিটাস প্রফেসর স্কটিশ চার্চ কলেজ : কলিকাতা, কলিকাতা,
যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক;
কাব্যসাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন, বাংলা সাহিত্যের
ইতিহাস, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ,
রবি-পরিক্রমা, রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা,
রবীন্দ্র নাট্যসমীক্ষা, রচনা চতুরঙ্গ
প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা।

প্রকাশক :

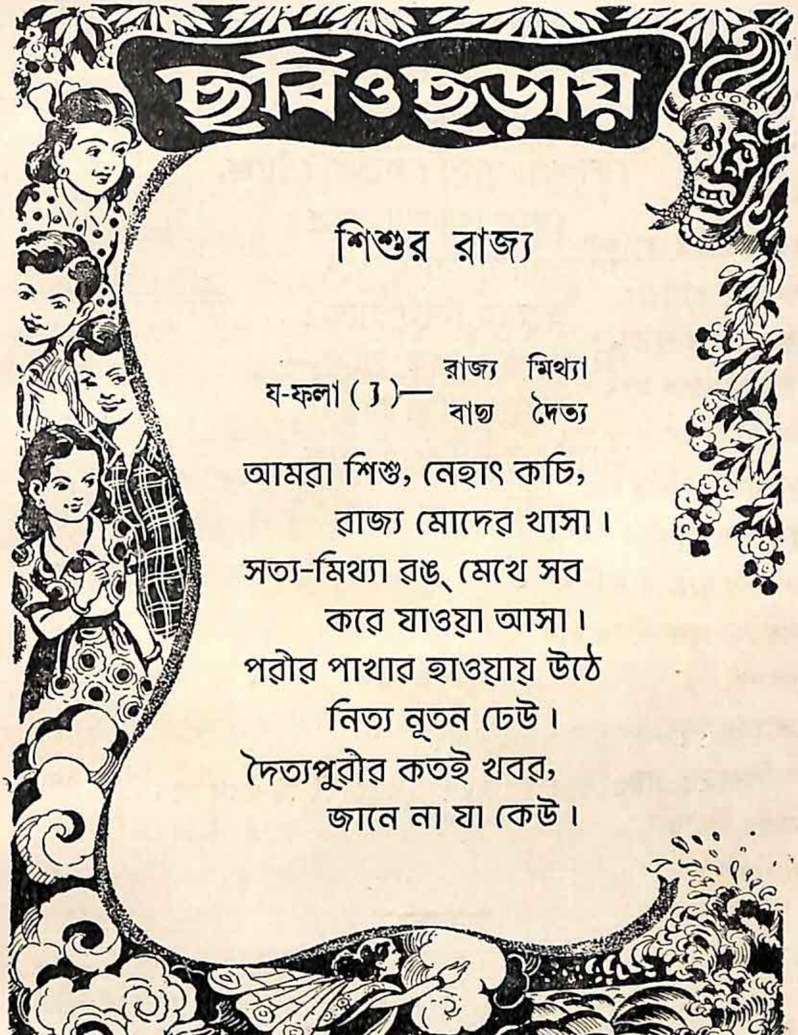
শ্রীআশুতোষ দাস

ষ্টুডেন্টস্ বুক সাপ্লাই

১৫, কলেজ স্কোয়ার,

কলিকাতা-৭০০০৭৩

সূচীপত্র



শিশুর রাজ্য

য-ফলা (্য)— রাজ্য মিথ্যা
বাদ্য দৈত্য

আমরা শিশু, নেহাৎ কচি,
রাজ্য মোদের খাসা।
সত্য-মিথ্যা রঙ্ মেখে সব
করে যাওয়া আসা।
পরীর পাখার হাওয়ায় উঠে
নিত্য নূতন ঢেউ।
দৈত্যপুরীর কতই খবর,
জানে না যা কেউ।

ঘোড়ার হেথা ডানা গজায়,
তালপাতার খাঁড়া।
রূপকথায় মন ভরে' যায়,
নেইক পড়ার তাড়া।
ফোকলা-বুড়ো দোকলা খোঁজে,
মেলে মোদের সাথে ;
বকবকানির পালা শুরু
হয় রে দিনে রাতে।
ঝাঁ-গুড়্‌গুড়্‌ বাদ্য বাজে,—
মায়ের চুমো তায়।
আসবি যদি শিশুর দেশে
আয় রে ছুটে' আয় !

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুশীলনী

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। শিশুর রাজ্যটি কেমন ? সেখানে কি কি থাকে বল।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা

এক ছিল চতুর ছাগল। ঘাস খুজতে খুজতে এল এক পাহাড়ের ধারে। পাহাড়ের ধারে পৌঁছে দেখে সারা পাহাড় কচি কচি সবুজ ঘাসে ভরা। ছাগল মনের সাধ মিটিয়ে সারাদিন ধরে ঘাস খেলে। এত ঘাস খেল যে সে আর নড়তে পারে না।

তারপর পান করলে পাহাড়ের নদীর জল। তখন আর তার নড়াচড়ার উপায় নেই। পথ চলতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে, কেবল হোঁচট খায়। তাই সে ভাবলে—রাতটা সেইখানেই কাটাবে। ভোর হলে নিজের ঘরে ফিরবে।

হঠাৎ দেখে—সামনেই পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা। ছাগল ভাবলে, যাক বাঁচা গেল। এইবার গুহায় একটু আরাম করে ঘুমিয়ে নি। গুহায় ঢুকে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে সে গুহাটি ছিল এক বাঘের। বাঘ রাতে গুহায় ফিরে তো অবাক। কে যেন তার গুহা দখল করে শুয়ে রয়েছে। এত সাহস কার! রাগে বাঘটা গোঁ গোঁ করে উঠল। তার পর ছাড়ল এক বিকট হাঁক, "বাঘের ঘরে ঢোকে এমন সাহস কার? এখনই ভাঙব তোর ঘাড়।"

বাঘের সেই হাঁকডাক শুনে ছাগল ধড়মড় করে উঠে বসল। ভয়ে তার মুখ গেল শুকিয়ে। চমকে উঠল সে! আরে, এযে বিরাট এক বাঘ! আজ আর তার রক্ষা নেই। বোধ হয় বাঘের পেটে যেতে হবে।

চতুর ছাগল মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে বাঘা, সাবধান! আমার নাম ঘোগ। আজ আমি তোর ঘাড় মটকাবো।"



এই কথা শুনে বাঘ ভয় পেয়ে গেল। মনে মনে ভাবলে, ঘোগ আবার কি? সে আবার কি বিকট জানোয়ার!

ছাগল আবার ভারী গলায় বলে ওঠে, "আর এক পা এগিয়ে এসেছিস কি তোর ঘাড়টা ভেঙেছি!"

বাঘ ভয়ে ভয়ে বলে, "ওরে ঘোগ, বাসাটা যে আমার।"

ছাগল আরও জোরে চিৎকার করে ভারী গলায় বললে,

"বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।
কড়মড়িয়ে খাব খাসা।"

বাঘ ভাবলে, তবে তো ঘোগের দাঁতে খুবই ধার! আমাকে কড়মড়্ করে চিবিয়ে খেতে চায়! ওবাবা, আর এগিয়ে কাজ নেই। এই ভেবে বাঘ লেজ তুলে দিল চোঁ-চা দৌড়। ছাগল তখন আমোদে লাফাতে লাগল।

অনুশীলনী

১। ছাগল পাহাড়ের গুহায় ঘুমোতে চেয়েছিল কেন ?

২। বাঘ গুহায় ফিরে কি দেখল ?

৩। বাঘের ডাক শুনে চতুর ছাগল বাঘকে কি বলেছিল ?

৪। বাঘ লেজ তুলে পালিয়ে গেল কেন ?



র-ফলা (্র)—

দ্রুত বক্র অশ্রু

ভ্রমণ হিংস্র ভদ্রতা বিদ্রূপ ব্যাঘ্র শুশ্রূষা

ব্যাঘ্র মশাই, মেনি-বিড়াল তোমার নাকি মাসী ?
বোন-পো এমন হিংস্র হয়, দেখে' যে পায় হাসি।
মানুষ তোমার শত্রু কিসে ? ঘাড়টি ভাঙো তার !
ভদ্রতা নেই, এমনি তুমি বন্য জানোয়ার।
রাত্রিকালে ভ্রমণ কর, যাও শিকারের খোঁজে ;
দিনের বেলা নিদ্রা লাগাও বন-বাদাড়ে ঘোঁজে।
চুপিসারে চল দ্রুত ; বক্র তোমার নখ ;
মাংস ছিঁড়ে ভোজন কর,—কি গজরানি, রোখ !
'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা' এই ত শোনা যায়—
ওষুধ দিয়ে, শুশ্রূষাতে প্রাণ বাঁচানো দায়।
বাঘের মাসী বিদ্রূপ কি ? সত্য কথা নয় !
বোন-পো হ'লে, বুনো বাঘের এমন মতি হয় ?
তোর আচরণ শুনে বাঘা, বিড়াল দুঃখে মরে,
চোখ দু'টি তার বেয়ে বেয়ে কতই অশ্রু ঝরে।

—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভল্লুক-নাচ

ল-য-লা (্ল)— ম্লান পল্লী ক্লেশ
ভল্লুক আহ্লাদ



পল্লীর শিশু ভল্লুক দেখে' আহ্লাদে আটখান।
নাচে ভল্লুক নাকে বাঁধা তা'র দড়িতে পড়িলে টান।
শিশু বলে,—ভাই, কোন ক্লেশ নাই, তবে কেন ম্লান মুখ?
দুঃখ মিছেই শুধু,—খেতে দেব মধু, নাচ দেখা ভল্লুক!

অনুশীলনী

তোমরা ভল্লুক-নাচ দেখেছ? ভল্লুক কি খেতে ভালবাসে?



ব-ফলা (্ব)—রাজত্ব স্বাধীন তেজস্বী সরস্বতী

অনেক দিন আগের কথা। ইংরেজ রাজত্ব। দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি।

কলকাতার ময়দানের মাঝখান দিয়ে একটি পথ আছে। পথটির নাম রেড্ রোড্। একদিন বিকালে দেখা গেল, একটি জুড়ি গাড়ি সেই পথের দিকে ছুটে চলেছে। গাড়ির মধ্যে একজন খাঁটী বাঙালী ভদ্রলোক। পরনে খুব সাদাসিধে পোশাক। কিন্তু চেহারাটি বিরাট।

গাড়ি রেড্ রোডের মুখ-বরাবর যেতেই সেখানকার গোরা পাহারাওয়ালা গাড়িটাকে রুখলে। "এ পথে ভারতীয়দের যাবার হুকুম নেই। এ পথ কেবল ইংরেজদের জন্য।"

আরোহী বাঙালীটি অমনি বাঘের মত হুংকার দিয়ে বললেন—"জানো, আমি প্রধান বিচারপতি! আমাকে বাধা দেবার অধিকার তোমার নেই।"

এর পর গাড়োয়ানকে বললেন, "গাড়ি হাঁকাও।"

গোরা পাহারাওয়ালার আর সাহস হল না যে গাড়িটাকে বাধা দেয়। গাড়ি রেড্ রোডের ওপর দিয়ে চলে গেল। সেই প্রথম রেড্ রোডের ওপর দিয়ে একজন ভারতীয়ের গাড়ি চলল।

বাড়ী ফিরেই ভদ্রলোকটি সোজা ফোন করলেন তখনকার যিনি বাংলার লাটসাহেব ছিলেন, তাঁকে। বললেন—"আমি কলকাতার প্রধান বিচারপতি কথা বলছি। রেড্ রোড্ দিয়ে এদেশের লোকেরা কি যাতায়াত করতে পারে না?" উত্তরে লাটসাহেব বললেন, "আপনি যেতে পারেন।"

ভদ্রলোকটি তখনই উত্তর দিলেন, "আমি আমার নিজের জন্য আপনাকে কিছু বলছি না। প্রত্যেক ভারতবাসীর হয়ে একথা আজ আমি আপনার কাছে জানতে চাইছি।"

লাটসাহেব বুঝলেন—এ বড় কঠিন ঠাঁই। অগত্যা বললেন, "আপনার দাবি মেনে নিলাম। আজ থেকে ইংরেজ ও ভারতীয় সবাই অবাধে রেড্ রোড্ দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে।"

রেড্ রোড্ এতদিন ছিল ভারতীয়দের অপমানের প্রতীক। যে তেজস্বী বাঙালী ভদ্রলোকের জন্য ভারতীয়দের সেই অপমানের প্রতিকার হয়েছিল, তিনি সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। 'বাংলার বাঘ' নামে তিনি তাঁর দেশবাসীর কাছে আজও পরিচিত। তিনি

ছিলেন সেকালের কলকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষের হাতেই গড়ে ওঠে। তিনি ছিলেন সরস্বতীর বরপুত্র। তিনি আজীবন দেশ ও জাতির সেবা করে গেছেন।

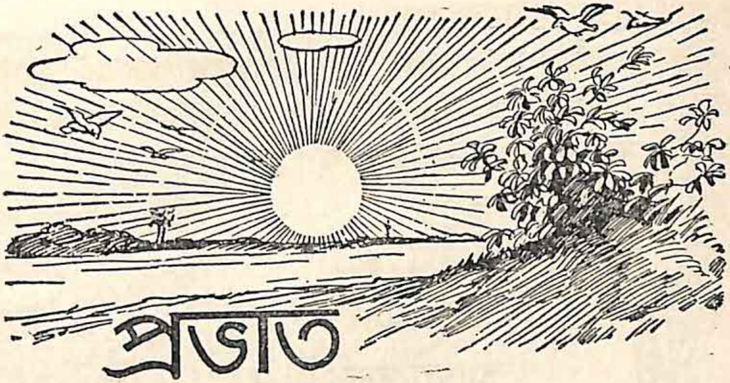
অনুশীলনী

১। রেড্ রোড্ প্রথমে কারা ব্যবহার করতেন ?

২। কে এই পথ ভারতীয়দের জন্য খুলে দেন ?

৩। কিভাবে এই পথটি ভারতীয়দের জন্য উন্মুক্ত হয় তা বল।

৪। সার্ আশুতোষের প্রধান কীর্তি কি কি ? সংক্ষেপে বল।



প্রভাত

হোলো ভোর, খোলো দোর—আর ঘুম নয় ;
সবাই জেগেছে, শুধু খোকা ঘুমে রয় !
ঝল্‌মল্ করে রোদ আকাশের গায়,
ঝুরু-ঝুরু হাওয়া চলে, পরাণ মাতায় ।
ফুলে ফুলে দলে দলে মৌমাছি, অলি চলে,
তুল্‌তুলে ফুল-কলি ফোটে এ-সময় ;
ওঠো ওঠো খোকাবাবু, আর ঘুম নয় !

—সুনির্মল বসু

অনুশীলনী

কবিতাটি আবৃত্তি কর ।



আমাদের গ্রাম, গৃহ ও বিদ্যালয়

আমাদের গ্রাম। গ্রামের নাম বিল্বগ্রাম। গ্রামের মধ্যে মধ্যে সারি সারি গাছপালা, বাগান, কৃষির জন্য জমি। গাছতলায় জায়গায় জায়গায় কতকগুলি করে কুটীর—ছায়ায় ঢাকা। গাছপালায় কত রঙের ফুল। বাগানে নানারকম ফল। কৃষির জমিতে রকমারি শস্য।

আঁকা-বাঁকা মেঠো রাস্তায় গোরুর গাড়ি কত কি জিনিস নিয়ে সারাদিন চলাচল করছে। গ্রামের ধার দিয়ে ছোট্ট একটি নদী। নদীটির নাম সরস্বতী। নদীটির জল যেন আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া। নদীর ধারে কত হাঁস, কত বক সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। গাছের ডালে কত ছোট ছোট পাখী মধুর স্বরে গান করে, বাসা বাঁধে।

আমাদের গ্রামের বাড়ীগুলি সাধারণত টিনের বা খড়ের ছাওয়া।

আমাদের গ্রামের বেশীর ভাগ লোক কৃষক। তারা জমি চাষ করে, শস্য ফলায়। কয়েকঘর জেলেও আছে, তারা মাছ ধরে। সেই মাছ গ্রামে বা হাটে বিক্রি করে। গ্রামের মধ্যে কিছু কুমোর, কামার, ছুতোর, তাঁতীও আছে। তারা নানারকম হাতের কাজ করে। মাটি, লোহা ও কাঠ দিয়ে নানারকম জিনিস তৈরি করে। তাঁতীরা-সূতীর কাপড় বোনে।

আমাদের গ্রামের তৈরী বাঁশের ঝুড়ি, বেতের জিনিস-পত্র, বাঁশের ও কাঠের খেলনা খুব ভাল। আমাদের গ্রামে আর তার আশেপাশেও প্রচুর তূলা হয়। সেই তূলা থেকে সূতা তৈরী হয়। গ্রামেরই তৈরী সূতা থেকে নানারকম কাপড়, গামছা ও মশারির থান এখানে তৈরী হয়।

গ্রামের পূব দিকে একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়। সেখানে আমাদের গ্রামের ছেলেরা পড়ে। আশপাশের অন্য গ্রামের অনেক ছেলেও পড়তে আসে। বিদ্যালয়ের সামনে একটি বড় খেলার মাঠ। সেখানে ছেলেরা ছুটির পর খেলাধুলো করে।

আমরা আমাদের এই গ্রামখানিকে বড় ভালবাসি। এখানকার ছায়াশীতল গাছের তলে কত খেলা আমরা করি। এই গ্রামে কত উৎসব, কত পূজা হয়। এই গ্রামেরই মাটি দিয়ে আমরা দেবতা গড়ি, সেই দেবতার

আমরা পূজা করি। এই গ্রামের বুকে ঘর বেঁধে আমরা এখানে বাস করছি আরামে। এ গ্রাম চিরদিনই আমাদের কাছে সোনার গ্রাম। গ্রামখানি আমাদের মায়ের মত প্রিয়—মায়ের মত আপন।

অনুশীলনী

১। গ্রামের একটি বর্ণনা দাও।

২। বিল্বগ্রামের লোকেরা কি কি হাতের কাজ করে ?

৩। আমরা গ্রামকে ভালবাসি কেন ?

লিলিপুটের দেশে গালিভার



ন-ফলা—যত্ন, স্বপ্ন　　　ণ-ফলা—বিষণ্ণ, অপরাহ্ণ

হঠাৎ একটা চোরা পাহাড়ের গায়ে লেগে জাহাজডুবি হল। গালিভার সেই জাহাজে ছিল। জলে পড়ে সে সাঁতার কাটতে লাগল। চারদিকে শুধুই নীল জল। সাঁতার কেটে বেচারা পারবে কেন? হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ভাসতে লাগল। বাতাস আর ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল—কোথায় কে জানে?

কিছুক্ষণ বাদেই গালিভারের মনে হল, তার মাথাটা যেন কিসে ঠেকছে। মাথা তুলতেই দেখে—একটা চড়া। কোনরকমে উঠলো সেই চড়ায়। দেশটার মধ্যে চলল হেঁটে, মানুষের খোঁজে।

সে অনেক দূর হাঁটল—কিন্তু বাড়ীঘর মানুষ কিছুই তার চোখে পড়ল না। এদিকে তার পা-ও যেন আর

চলতে চায় না। বেচারা শেষে বিষণ্ণ মনে এক জায়গায় ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল। শুতে না শুতেই গভীর ঘুম।

পরদিন অপরাহ্ণে তার ঘুম ভাঙলো। সে দেখলে—কারা যেন তার হাত-পা আর দেহটা দড়ি দিয়ে বেশ করে জড়িয়ে বেঁধেছে।

এমনি সময় কানের পাশে কাদের যেন সাড়া পাওয়া গেল। কারা যেন সুড়সুড় করে চলাফেরা করছে তার বাঁ পায়ের ওপর দিয়ে। গালিভার ভাবল স্বপ্ন নাকি? তারপর চেয়ে দেখলে—ভারি মজার ব্যাপার ত'! একদল ছোট্ট ছোট্ট মানুষ। এক বিঘতের চেয়েও ছোট মাপের তারা। গালিভার চেঁচিয়ে বললে—কে? তোমরা কারা?

লোকগুলো ভয় পেয়ে টুপ্ টুপ্ করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। গালিভার এবার একটা ঝাঁকুনি দিল সারা দেহে। পট্ পট্ করে সব দড়ি ছিঁড়ে গেল। বাঁধন ছিঁড়ে দাঁড়িয়ে উঠল গালিভার। তারপর মাটি থেকে সেই ক্ষুদে মানুষদের একটাকে তুলে দাঁড় করালে তার হাতের চেটোয়। বেশ ভাল করে দেখলে ক্ষুদে মানুষটাকে।

সেটা এক আজব দেশ। সেদেশের লোকেদের নাম লিলিপুট।

গালিভারের খিদে পেয়েছিল। ইশারায় সে জানালে—তার বড় খিদে পেয়েছে। লিলিপুটেরা গালিভারকে ইশারা করলে—শুয়ে পড়ুন আপনি।

গালিভার সটান হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। একটু

পরেই লিলিপুটেরা খানকয়েক মই এনে লাগালো তার দেহের এপাশে-ওপাশে। ছোট ছোট লিলিপুটেরা সেই মই দিয়ে উঠে ঝুড়ি ঝুড়ি খাবার এনে ঢালতে লাগলো তার মুখে। কত ঝুড়ি যে সে খেল, তার হিসেব করা সহজ নয়।

তারপর আনলো জল। একটার পর একটা পিপে গড়িয়ে গড়িয়ে আনে গালিভারের মুখের কাছে। এক চুমুকে গালিভার সেই সব পিপে খালি করে দেয়।

এইবার শুরু হল লিলিপুটদের নাচগান। বাহারী সব পোশাক পরে সে তাদের কত রকমের নাচ! ব্যাপার দেখে ভারি হাসি পেল গালিভারের।

লিলিপুটদের যত্নে সে খুব খুশী হল।

অনুশীলনী

১। জাহাজডুবি হবার পর যেদেশে গালিভার পৌঁছল, সেদেশের লোকদের নাম কি?

২। লিলিপুটেরা কেমন মানুষ? তাদের বর্ণনা দাও।

৩। ক্ষুধার্ত গালিভারকে লিলিপুটেরা কিভাবে খাইয়েছিল?

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী

ম-ফলা (ৃ)— জন্ম পদ্ম ব্রাহ্মণ সম্মান

এক ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। খুব বিদ্বান ছিলেন বলে লোকে তাঁকে খুবই সম্মান করত। কিন্তু তাঁর মস্ত দোষ, তিনি বড়ই ভুলো। এক করতে গিয়ে ভুলের বশে আর এক কাজ করে বসতেন।

একদিন হয়েছে কি—রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর রান্নাঘর থেকে লাঠি হাতে করে তিনি শোবার ঘরে এলেন। নিজে শোবেন,—না লাঠিকে বিছানায় শুইয়ে নিজে গিয়ে ঘরের কোণে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ব্রাহ্মণীর নাম পদ্মাবতী। তিনি এসে দেখেন—বিছানায় তো ব্রাহ্মণ নেই!

ব্রাহ্মণী। ও ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণ। কি গো ব্রাহ্মণী!

ব্রাহ্মণী। তুমি ওখানে আর লাঠি বিছানায় কেন?

ব্রাহ্মণ ঠকবেন কেন! বললেন,—"লাঠি বেচারী আরাম করতে চায়।"

ব্রাহ্মণী হেসে বললেন,—"ও, তাই বুঝি!"

আর একদিন ব্রাহ্মণ চশমা খুঁজে নাকাল। রাগে ঘটি-বালতি, হুঁকো-কলকে—সব টান দিয়ে ফেলে দিলেন।

তারপর যখন ভাতেরহাঁড়ি ফেলে দিলেন, তখন ব্রাহ্মণী খুব রেগে বললেন,—"বলি, ব্যাপার কি বল তো!"

ব্রাহ্মণ বলে উঠলেন,—"আমার চোখের চশমা গেল কোথায় ? চশমা না পেলে সব শেষ করে ফেলব।"

ব্রাহ্মণী বললেন,—"তা আগে বলতে হয়! চশমা তো তোমার চোখেই রয়েছে!"



ব্রাহ্মণ চোখে হাত দিয়েই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

ব্রাহ্মণী তখন বললেন,—"এখন হাটে যাও! একটা হাঁড়ি কিনে না আনলে, আজ আর উনোনে হাঁড়ি চড়বে না, তা বলে রাখছি।"

ব্রাহ্মণ আর কি করেন! চাদর গলায় দিয়ে সুড়্‌সুড় করে হাটে চললেন হাঁড়ি কিনতে।

নির্ভাবনা

রেফ (´)— তর্ক দীর্ঘ

মূর্খ নির্ভাবনা



বিদ্যানিধি পড়েন, শোনেন—
হাঁড়ি ঠন্ঠন্।





তর্করত্ন তর্ক জোড়েন,—
লাঠির ঝন্ঝন্।





দীর্ঘ টিকি গুরু নাড়েন,
সবাই ভয় পায়।



মূর্খ ভোলার নির্ভাবনা,
পেটটি ঠেসে খায়।



ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগ (দুই অক্ষরে—১)

ক্ ক—ক্ক এক্কা

ক্ ত—ক্ত শক্তি

ক্ ষ—ক্ষ রক্ষা



জোর বরাত—খুব রক্ষা! ধাক্কা খাই নাই!
এক্কা চাপা পড়লে পরে অক্কা পেতাম ভাই!



গ্ ধ—গ্ধ দুগ্ধ

ঙ্ ক—ঙ্ক কলঙ্ক

ঙ্ খ—ঙ্খ শঙ্খ

ঙ্ গ—ঙ্গ গঙ্গা

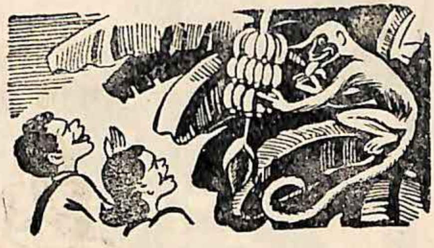
দুগ্ধ খাও খুকুমণি, শক্তি নেই গায়!
কলঙ্কের কথা বড়—হায়, হায়, হায়!

চ্ চ—চ্চ উচ্চ

চ্ ছ—চ্ছ ইচ্ছা

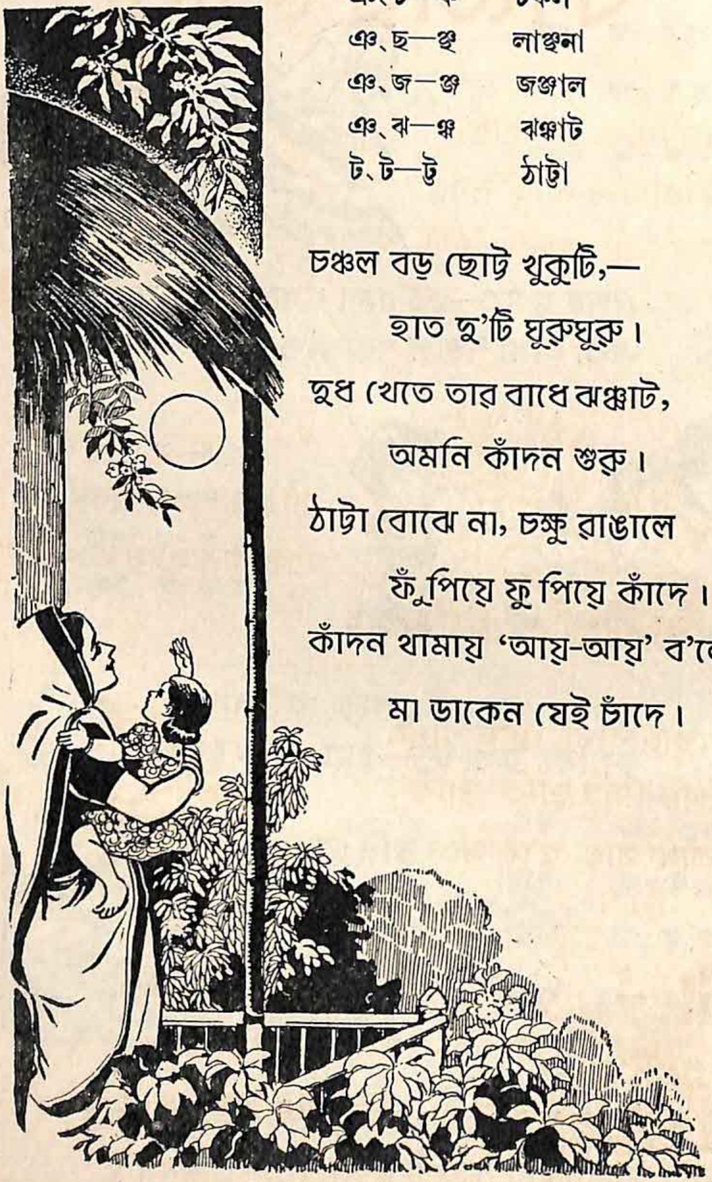
জ্ জ—জ্জ লজ্জা

জ্ ঞ—জ্ঞ জ্ঞান



উচ্চে বসে' খাচ্ছ কলা, নেইক লজ্জা-জ্ঞান!
ইচ্ছা করে লেজটি টানি, বেটা হনূমান!

ঞ, চ—ঞ্চ চঞ্চল
ঞ, ছ—ঞ্ছ লাঞ্ছনা
ঞ, জ—ঞ্জ জঞ্জাল
ঞ, ঝ—ঞ্ঝ ঝঞ্ঝাট
ট, ট—ট্ট ঠাট্টা



চঞ্চল বড় ছোট্ট খুকুটি,—
হাত দু'টি ঘুরুঘুরু।
দুধ খেতে তার বাধে ঝঞ্ঝাট,
অমনি কাঁদন শুরু।
ঠাট্টা বোঝে না, চক্ষু রাঙালে
ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে।
কাঁদন থামায় 'আয়-আয়' ব'লে
মা ডাকেন যেই চাঁদে।

কাজের লোক



“মৌমাছি, মৌমাছি,
কোথা যাও নাচি’ নাচি’,
দাঁড়াও-না একবার ভাই !”



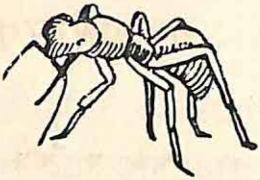
“ওই ফুল ফুটে বনে,
যাই মধু আহরণে,
দাঁড়াবার সময় ত নাই ।”



“ছোট পাখী, ছোট পাখী,
কিচি-মিচি ডাকি’ ডাকি’,
কোথা যাও, ব’লে যাও শুনি !”



“এখন না ক’ব কথা,
আনিয়াছি তৃণলতা,
আপনার বাসা আগে বুনি ।”



"পিপীলিকা, পিপীলিকা,
দলবল ছাড়ি' একা
কোথা যাও, যাও ভাই, বলি'।"



"শীতের সঞ্চয় চাই,
খাদ্য খুঁজিতেছি তাই,
ছয় পায় পিল্ পিল্ চলি'।"

—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

অনুশীলনী

১। কবিতাটি চারজনে মিলে আবৃত্তি কর।
২। বানান কর ঃ—আহরণ, তৃণ, পিপীলিকা, সঞ্চয়।

ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগ (দুই অক্ষরে—২)

ণ্ ট—ণ্ট ঘণ্টা

ণ্ ঠ—ণ্ঠ কণ্ঠ　　ণ্ ড—ণ্ড মোণ্ডা

ত্ ত—ত্ত উত্তম　　ত্ থ—ত্থ অশ্বত্থ

ঘণ্টা বেজে গেল, ও ভাই, ছুটি—এবার ছুটি।
মোণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে খেলবো ছুটোছুটি।

দ্ দ—দ্দ চৌদ্দ

দ্ ধ—দ্ধ বুদ্ধি　　দ্ ভ—দ্ভ অদ্ভুত

ন্ ত—ন্ত দন্ত　　ন্ থ—ন্থ গ্রন্থ

ন্ দ—ন্দ সন্দেশ　　ন্ ধ—ন্ধ অন্ধকার



হেবোর বয়স চৌদ্দ বছর;—
বুদ্ধি মোটে নাই।
অদ্ভুত তার কথাগুলো
শুনেই হাসি ভাই।
সে বলে কি—দন্ত দিয়ে
জল চিবিয়ে খাই;
সন্দেশ খাই ঢক্‌ঢকিয়ে,
একটু না চিবাই।

প্ ত—প্ত তপ্ত

ব্ দ—ব্দ শব্দ



তপ্ত ভাতে ঘি দিয়েছি,

আরও দেব কি ?

আর আব্দার করো না,

লোকে বলবে, 'ছি! ছি!'



ম্ প—ম্প কম্প

ম্ ফ—ম্ফ লম্ফ

ম্ ব—ম্ব কম্বল

ম্ ভ—ম্ভ আরম্ভ

দুধের কড়া

শিকেয় তোলা,

পুষি এবার জব্দ !

লম্ফ-ঝম্ফ

সার—মিছে

ম্যাও-ম্যাও শব্দ ।



বর্ষার দিনে

দিনের আলো নিবে এল,
সূয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে,
রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা
বাজল ঠঙ্‌ ঠঙ্‌।
আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা,
কোথায় বা সীমানা—
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়,
কেউ করে না মানা।
কত নূতন ফুলের বনে
বৃষ্টি দিয়ে যায়,
পলে পলে নূতন খেলা
কোথায় ভেবে পায়?

মেঘের খেলা দেখে কত
খেলা পড়ে মনে,
কত দিনের লুকোচুরি
কত ঘরের কোণে !
তারই সঙ্গে মনে পড়ে
ছেলেবেলার গান—
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
নদেয় এলো বান।

(সংক্ষেপিত)

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।

২। আকাশে মেঘ কার লোভে জমায়েত হয় ?

৩। মেঘের খেলা দেখে কি মনে পড়তে থাকে ?

ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগ (দুই অক্ষরে—৩)

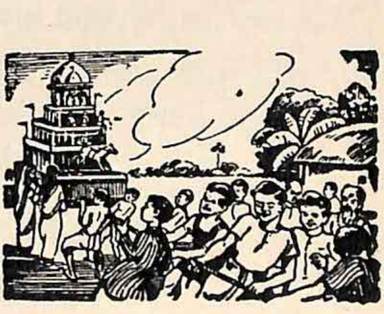
ল্ ক—ল্ক পাল্কি	শ্ চ—শ্চ নিশ্চয়	ষ্ প—ষ্প পুষ্প
ল্ গ—ল্গ ফাল্গুন	ষ্ ক—ষ্ক শুষ্ক	ষ্ ফ—ষ্ফ নিষ্ফল
ল্ ট—ল্ট উল্টা	ষ্ ট—ষ্ট কষ্ট	স্ ক—স্ক পুরস্কার
ল্ প—ল্প গল্প	ষ্ ঠ—ষ্ঠ ওষ্ঠ	স্ ত—স্ত হস্ত

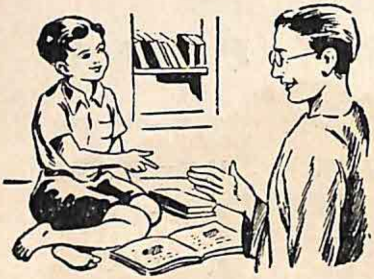
স্ থ—স্থ সুস্থ   স্ প—স্প পরস্পর



সে-ফাল্গুনে বৌদি আমার
গেছে বাপের বাড়ী।
ওগো দাদা, দাও পাঠিয়ে
পাল্কি তাড়াতাড়ি।

রথ যে গেল, উল্টা-রথের
আর কতদিন বাকি ?
ঐ দিনেতে সত্যি আমার
বৌদি আসবে নাকি ?





ভাল নাহি লাগছে আমার
শুকনো বইয়ের পড়া !
বৌদিদির কোলে ব'সে
শুনব গল্প-ছড়া।

মিশ্রবর্ণ-সংযোগ

ক্ ষ, য-ফলা—লক্ষ্য
ক্ ষ, ম-ফলা—লক্ষ্মী
জ, জ, ব-ফলা—উজ্জ্বল
ত, ম্ য-ফলা—দৌরাত্ম্য
ন্ ত, র-ফলা—যন্ত্রণা
ন্ ত, ব-ফলা—সান্ত্বনা
ন্ দ্ র-ফলা—চন্দ্র
ন্ দ্ ব-ফলা—দ্বন্দ্ব
ন্ ধ, য-ফলা—সন্ধ্যা
ন্ ন্ য-ফলা—সন্ন্যাসী
ম্ ভ, র-ফলা—সম্ভ্রম
ম্ প, র-ফলা—সম্প্রদান
স্ ত, র-ফলা—বস্ত্র
স্ থ, য-ফলা—স্বাস্থ্য

* * * *

মূর্ছা পার্শ্ব আর্দ্র ঈর্ষা
ন্ ত, উ—ন্তু জন্তু

বাবু, বিবি হাওয়া খান,
ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান।



তোমরা গান্ধীজীর কথা শুনেছ। তিনি ছিলেন সকলের বাপুজী।

তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসতেন। "কাকেও হিংসা করো না"—এই ছিল তাঁর উপদেশ।

ছেলেবেলায় গান্ধীজীর খুব ভয় ছিল। তিনি একা অন্ধকারে ঘর থেকে বার হতে পারতেন না। তাঁদের বাড়ীর এক বুড়ী-ঝি তাঁর সেই ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছিল। সেই ঝির নাম ছিল রম্ভা। সে গান্ধীজীকে রাম-নাম করতে শিখিয়েছিল। রাম-নাম উচ্চারণ করে গান্ধীজী মনে খুব বল পেতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি রামধূণ-গান গাইতেন—

"রঘুপতি রাঘব রাজারাম,
পতিতপাবন সীতারাম!"

মুচি, মেথর, ডোম, চাঁড়াল, এই সকল জাতের লোককে এদেশের সাধারণ মানুষ ঘৃণার চোখে দেখে। এমনকি তাদের ছোঁয়ও না। গান্ধীজী এতে মনে বড় ব্যথা পেতেন। এই সকল শ্রেণীর লোককে তিনি বলতেন 'হরিজন'। হরিজন মানে হরির অর্থাৎ ভগবানের আপনার জন।

বাল্যকাল থেকেই গান্ধীজী অনেক সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। কোন মানুষকেই তিনি ঘৃণা করতেন না। তাঁদের বাড়ীর মেথর উকাকে তাঁর খুব ভাল লাগত। মেথরের কাজ তাঁর কাছে নিন্দার কাজ ছিল না। মায়ের কথা অমান্য করে একদিন তিনি উকাকে ছুঁয়েছিলেন। আবার তিনি এমনই সত্যবাদী ছিলেন যে সে-কথা মাকে না বলেও থাকতে পারেন নি।

মেথরকে ছোঁয়ার জন্যে মা তাঁকে স্নান করিয়ে দিয়েছিলেন। তবুও গান্ধীজী মাকে বলতে ছাড়েন নি যে, উকা মেথর হলেও মানুষ, তাকে ছুঁলে কোন দোষই হয় না।

অনুশীলনী

১। গান্ধীজী কেমন মানুষ ছিলেন ?

২। তিনি কাদের হরিজন বলতেন ?

৩। তিনি উকা মেথরকে ছুঁয়েছিলেন কেন ?



আগ্নেয় গিরি

যেসব পাহাড়ের ভেতর থেকে ধোঁয়া, আগুন, গলিত ধাতু, ছাই, এসব বেগে উপরের দিকে বার হয় তাদের বলে আগ্নেয়গিরি। পাহাড়ের ভেতর থেকে এই রকম ধোঁয়া, আগুন, গলিত ধাতু প্রভৃতি উদ্গিরণকেই বলে অগ্ন্যুৎপাত।

ইটালীদেশে এমনি একটি আগ্নেয়গিরি ছিল। তার নাম ভিসুভিয়াস। ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির কাছে ছিল পম্পাই নামে একটি সুন্দর নগরী।

প্রায় দুহাজার বছর আগের কথা। পম্পাই নগরী তখন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। কত দেশবিদেশের লোক সেখানে প্রকৃতির শোভা দেখতে আসতেন। নগরী সব সময়ই আনন্দ উৎসবে ভরে থাকতো।

এমনি এক উৎসব-মুখরিত দিনে যখন সবাই উৎসবে মেতে আছে—এমন সময় হঠাৎ ভয়ঙ্কর এক শব্দ হ'ল। সেই শব্দে চমকে উঠল পম্পাইবাসীরা।—তারা দেখল ভিসুভিয়াসের চূড়া থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী

পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশে উঠছে। ধীরে ধীরে ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে সারা আকাশ ছেয়ে গেল। রাশি রাশি পাথর আর ভয়ানক আগুন বার হ'তে লাগল পাহাড় থেকে। দেখতে দেখতে গলিত ধাতুর স্রোত নেমে এলো পাহাড়ের গা বেয়ে। ক্ষেত-খামার গাছপালা ঘরবাড়ী জ্বলে উঠল দাউ-দাউ করে।

পম্পাই নগরীর আনন্দ-কোলাহল নিমিষে বন্ধ হয়ে গেল। ভয়ে লোকেরা ছুটে যে যেদিকে পারে



পালাতে লাগল। কিন্তু পালাবে কোথায়! বিপদের ওপর বিপদ।

পায়ের তলার মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল। বড় বড় ঘরবাড়ী হুড়হুড় করে ভেঙে পড়তে লাগল

তাদের মাথার ওপর। সাগরের জল পর্বতপ্রমাণ উঁচু হয়ে বেগে কূল ছাপিয়ে ছুটে এলো নগরীর দিকে। পম্পাইয়ের পথঘাট তলিয়ে গেল জলের তলায়।

ধীরে ধীরে নগরীটি চাপা পড়ে গেল মাটির নীচে। নগরীর সমস্ত প্রাণী, সমস্ত ঘরবাড়ী মিলিয়ে গেল পৃথিবীর বুক থেকে। সে এক ভয়ানক দৃশ্য!

অনুশীলনী

কি করে পম্পাই নগরী ধ্বংস হ'ল নিজের কথায় বল।



আদর্শ ছেলে

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হ'য়ে কাজে বড় হবে।
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
"মানুষ হইতে হবে"—এই যার পণ।
বিপদ আসিলে কাছে হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ ?
হাত-পা সবারই আছে, মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয় ?
সে ছেলে কে চায় বল—কথায় কথায়,
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায় ?
সাদা প্রাণে, হাসি মুখে কর এই পণ—
"মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন।"

(সংক্ষেপিত)

—কুসুমকুমারী দাসী

অনুশীলনী

১। আদর্শ ছেলে হতে হলে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন ?

২। কবি কিরূপ ছেলেকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন ?

বানরের বুদ্ধি

পশুদের মধ্যে অনেকের বেশ বুদ্ধি আছে। তোমরা হয়তো বানর-নাচ দেখেছ। বানরেরা অনেক সময় বুদ্ধির বেশ পরিচয় দেয়।

একদিন কোন গ্রামের বাইরে এক ইঁদারার পাড়ে কতকগুলি বানর লাফালাফি করে খেলা করছিল। সেই সময় হঠাৎ একটি বানর-ছানা ঐ ইঁদারার মধ্যে টুপ্ করে পড়ে গেল। ছানাটির কিচির-মিচির ডাক শুনে সব বানর ইঁদারার পাড়ে বসে নীচের দিকে ঝুঁকে চাইতে লাগল।



প্রথমে বানরগুলির ভয়ানক ভয় হ'ল। তারা কি করে ছানা-টিকে জলের মধ্যে থেকে তুলবে তা ঠিক করতে পারছিল না। কিছুক্ষণ পরেই তাদের মাথায় এক বুদ্ধি এল।

ঐ ইঁদারা হতে জল তুলবার জন্য দড়িতে বাঁধা

একটি বালতি কপিকলে ঝুলান ছিল। কতকগুলি বানর সেই দড়ির শেষ দিকটা শক্ত করে ধরে, বালতিটি ইঁদারায় নামিয়ে দিলে। একটি বানর দড়ি ধরে সড়্ সড়্ করে ইঁদারার ভেতরে নেমে গেল। তারপর ঐ বানর-ছানাটিকে জল থেকে টুক্ করে টেনে কোলে নিয়ে বালতির মধ্যে উঠে বসল।

তা দেখে উপরের বানরগুলির কি আনন্দ! তখন সকলে মিলে দড়ি টেনে বানর ও ছানাটিকে উপরে উঠিয়ে ফেলল। ছানাটির প্রাণ বাঁচল।

অনুশীলনী

ইঁদারার মধ্যে পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও কিভাবে বানর-ছানাটির প্রাণ রক্ষা পেল বল।



অতুলনীয় বীরত্ব

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। আমাদের এই দেশকে স্বাধীন করার জন্য যেসব দেশনেতা সারাজীবন ধরে চেষ্টা করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু প্রধান।

তখন ইংরেজদের সঙ্গে জার্মানদের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভারত তখনও স্বাধীন হয় নি। আমাদের দেশ তখনও ইংরেজের অধীন। সেই সময়ে ছদ্মবেশে ভারতবর্ষ ছেড়ে সুভাষচন্দ্র গিয়ে উপস্থিত হলেন জার্মানীতে। জার্মানরা তখন ইংরেজের বিপক্ষ দল।

এই মুক্তিপাগল বীর দেখেছিলেন যে, দেশে থেকে পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিসাধন সম্ভবপর নয়। এজন্যই ছদ্মবেশে তিনি পৌঁছলেন জার্মানীতে। সেখান থেকে

টোকিও—টোকিও থেকে সিঙ্গাপুর। সুভাষচন্দ্রের মনে একটিমাত্র স্বপ্ন—সে স্বপ্ন পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিস্বপ্ন।

ভারতের বাহিরে যেসব ভারতীয় ছিলেন, তাঁদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র ঐ সময়ে একটি সেনাদল গড়ে তোলেন। এর নাম দেন 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'। এই আজাদ হিন্দ্ ফৌজের উদ্দেশ্য ছিল—ভারতবর্ষকে তারা স্বাধীন করবে। দিল্লীর লাল কেল্লার উপর স্বাধীন ভারতের পতাকা ওড়াবে।

ভারতীয় বালক-বালিকাদের নিয়েও সুভাষচন্দ্র একটি সেনাদল গঠন করেছিলেন। এই বালক-সেনাদলের প্রধান কাজ ছিল শত্রুর ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা। তারা নিজেদের পিঠের ওপর বিস্ফোরক মাইন রেখে পথের এপাশে-ওপাশে লুকিয়ে থাকত। তারপর শত্রুর ট্যাঙ্ক আসতে দেখলেই, হঠাৎ বার হয়ে ঐ ট্যাঙ্কের তলায় শুয়ে পড়ত। অমনি ট্যাঙ্কের চাপে তাদের পিঠের মাইনগুলি দুম্-দুম্ করে ফেটে যেত। এতে বালক-সেনারা প্রাণ হারাত বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ট্যাঙ্কগুলিও ধ্বংস হয়ে যেত। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও ভারতীয় ছেলেরা সেদিন প্রাণ দিয়েছিল। তার কারণ, তারা তাদের দেশকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতে শিখেছিল।

অনুশীলনী

১। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কি? এদের উদ্দেশ্য কি ছিল?
২। সুভাষচন্দ্রের গঠিত বালক-সেনাদলের কি কাজ ছিল?
৩। যুদ্ধে বালক-সেনারা হাসিমুখে প্রাণ দিত কেন?



জল খেতে এক শিয়াল ভায়া
নামলো নদীর মাঝে,
চক্‌চকিয়ে পেটটি ভ'রে
পান করে জল আরাম ক'রে,—
টেরটি পেয়ে কুমীর এসে
কামড়ে ধরে পা যে !

চালাক শিয়াল টের পেয়ে তা,
চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ সেথা,—
'কে এসে তুই বোকার মতো
ধরলি আমার লাঠি !

ভাবলো কুমীর সোজাসুজি,
ধরেছে সে লাঠিই বুঝি,—
কামড় ছেড়ে আবার তেড়ে
ধরতে গেল পা-টি।



চালাক শিয়াল তড়াক্ ক'রে
লাফিয়ে উঠে ডাঙার 'পরে
মুচ্‌কি হেসে বললে তারে,—
'কুমীর বোকা ভারি।'

কুমীর তখন করবে কি আর,
বোকার মতো চায় চারিধার ;
চালাক শিয়াল খোশ মেজাজে
চললো নিজের বাড়ী।

—সুনির্মল বসু



নীল পরী

অলকাপুরী ! রাজা আর রাণী বাগানে বেড়াচ্ছেন। রাজকুমারেরা চাঁদের আলোয় ছুটোছুটি করছে। হঠাৎ এ কি ! চারিদিক হয়ে গেল আঁধার। সারারাজ্যে পড়ে গেল হৈ চৈ। সবারই মুখে এককথা—চাঁদ গেল কোথায় ?

এমন সময় নীল আকাশ থেকে একটা তারা খসে পড়লো অলকাপুরীতে। তারাটি বাগানে রাজার সামনে পড়বার আগেই হয়ে গেল এক পরী। পরীর শরীর থেকে বার হচ্ছে নীল রঙের অপূর্ব আলো।

পরী রাজাকে বললে—মহারাজ, আমি নীল পরী। চাঁদের অভাবে আপনার সারারাজ্য হয়ে গেছে অন্ধকার।

রাজা বললেন—হাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো—চাঁদের অভাবে আমার সারা রাজ্য ভরে গেছে আঁধারে। আচ্ছা নীল পরী, চাঁদ গেল কোথায় তুমি বলতে পার ?

নীল পরী বললে—মহারাজ, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে এক বন। সেই বনে থাকে এক ডাইনী বুড়ী। সেই তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

রাজা—কি সর্বনাশ, এখন তা হলে উপায় !



বড় রাজকুমার—নীল পরী, তুমি আমাকে নিয়ে চল। আমি ডাইনী বুড়ীকে মেরে চাঁদকে নিয়ে আসবো।

পরী—তুমি পারবে ?

রাজকুমার—নিশ্চয়ই পারবো।

পরী রাজকুমারকে ছুঁতেই তার দুটি ডানা দেখা দিল।

রাজকুমার তখন তলোয়ার নিয়ে পরীর হাত ধরলো। পরীও কুমারকে নিয়ে কত নদনদী, সাগর, পাহাড়, বন, দেশ পেরিয়ে উড়ে চলল। তার পর এসে থামলো এক গভীর বনে। রাজকুমার পরীর সঙ্গে চুপি চুপি এগিয়ে চলল। চলতে চলতে দেখে একটি কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে ডাইনী বুড়ী চরকা কাটছে।

রাজকুমার খুব সাবধানে পা টিপে টিপে ডাইনী বুড়ীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। ডাইনী বুড়ী কিছুই টের পেল না। তার পর তলোয়ারের এক কোপে কেটে ফেলল ডাইনী বুড়ীর মাথা।

পরী ছুটে এসে চরকাকে বলল—চরকা, ডাইনী বুড়ী চাঁদকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে ?

চরকা জবাব দিল—ঘরের ভেতরে দেখ মস্ত একটা কাঠের বাক্স। ওরই ভেতরে চাঁদ রয়েছে বন্দী।

রাজকুমার ঘরে গিয়ে সেই বাক্সের ডালা তুলল। অমনি চারদিক আলোয় ঝলমল করে উঠল। চাঁদ উঠে গেল আকাশে।

রাজকুমার পরীর সঙ্গে ফিরে এল আবার নিজের দেশে।

অনুশীলনী

১। চাঁদকে কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ?

২। চাঁদ কি করে আবার আকাশে গেল ?

হরধনুভঙ্গের কাহিনী



অনেক অনেক বছর আগেকার কথা। সরযূ নদীর ধারে অযোধ্যা নামে এক নগরী।

সেখানকার রাজা ছিলেন দশরথ। রাজা দশরথের চার ছেলে। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। চার ভাইয়ে খুব ভাব। চার ভাই নানা বিদ্যায় পণ্ডিত, যুদ্ধবিদ্যাতেও খুব নিপুণ।

রামের যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স, তখন

একদিন বিশ্বামিত্র মুনি অযোধ্যার রাজসভায় এসে হাজির হলেন। তিনি দশরথকে বললেন, "মহারাজ, রাক্ষসের উৎপাতে মিথিলায় মুনি-ঋষিদের যাগযজ্ঞ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সেজন্য আমি রাম লক্ষ্মণকে মিথিলায় নিয়ে যেতে চাই। রাম লক্ষ্মণ ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সেসব রাক্ষসকে বধ করার সাধ্য নেই।"

বিশ্বামিত্র মুনির কথা দশরথ ঠেলতে পারলেন না। তিনি তাঁর স্নেহের রাম লক্ষ্মণকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দিলেন।

মিথিলার পথে যেতে যেতে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণ এক বনে পোঁছলেন। সেখানে তাড়কা নামে এক রাক্ষসী থাকত। তাড়কা রাক্ষসীর বড় ভীষণ মূর্তি। তার চোখ-মুখ বিকটাকার। দেখলেই ভয় হয়।

বনের মধ্যে মানুষের সাড়া পেয়ে সে দাঁত কিড়মিড় করে রাম লক্ষ্মণকে পিষে মেরে ফেলবার জন্যে হুড়মুড় করে ছুটে এলো। রাম তার দিকে তীর ছুঁড়লেন। সেই তীরের আঘাতে তাড়কা রাক্ষসী গেল মরে।

তাড়কার মৃত্যুর পর তার পুত্র মারীচ তিন কোটি রাক্ষস নিয়ে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলো। রাম লক্ষ্মণ তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে সেই তিন কোটি রাক্ষসকেই মেরে ফেললেন। মারীচ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেল।

এর পর মিথিলায় আর রাক্ষসের ভয় রইল না।

এইবার বিশ্বামিত্র মুনি রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলার রাজা জনকের রাজধানীর দিকে গেলেন।

জনক রাজার এক পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিলেন। তাঁর নাম সীতা, অপর নাম জানকী। সত্যকারের একজন



বীরের সঙ্গে সীতার যাতে বিয়ে হয়, সেজন্য মহাদেব জনক রাজাকে একটি ধনুক দিয়ে বলেছিলেন— এই ধনুকে যে গুণ দিতে পারবে তার সঙ্গে যেন সীতার বিয়ে দেওয়া হয়। সীতাকে বিয়ে করবার জন্য দেশবিদেশ থেকে কত রাজা সেই হরধনুতে গুণ দিতে এসেছিলেন। কিন্তু গুণ

দেওয়া দূরের কথা, কোন রাজা ধনুকটিকে এতটুকু নোয়াতে পর্যন্ত পারেন নি।

জনক রাজার রাজধানীতে এসে বিশ্বামিত্র মুনি রামকে সেই ধনুতে গুণ দিতে বললেন। রাম তাতে গুণ দিতে গিয়ে এমন জোরে ধনুকটি নোয়ালেন যে তার ফলে ধনুকখানি মড়মড় করে ভেঙে দুখণ্ড হয়ে গেল। রাম যে মস্ত বড় বীর, তাঁর দেহে শক্তি যে অসীম, এ বিষয়ে কারও আর কোন সন্দেহ রইল না। সুতরাং সীতার সঙ্গে রামের বিয়ে হয়ে গেল।

অনুশীলনী

১। দশরথ কোথাকার রাজা ছিলেন? তাঁর চার পুত্রের নাম কি? বিশ্বামিত্র মুনি রাম লক্ষ্মণকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিলেন কেন? তাড়কা রাক্ষসীকে কারা মেরেছিল?

২। সীতা কার কন্যা ছিলেন? সীতার অন্য নাম কি ছিল? সীতাকে রাম কি উপায়ে বিয়ে করলেন বল।



সঙ্কল্প

মোরা ছুট্‌ব, মোরা খেল্‌ব,
বসে কুড়ে হয়ে থাক্‌ব না।

ছাতি ফাট্‌বে, মাথা ভাঙ্‌বে,
তবু খেলা ছেড়ে উঠ্‌ব না।

মোরা হাস্‌ব, ভয় নাশ্‌ব,
বাধা-বিপদেতে টল্‌ব না।

প্রাণ খুল্‌ব, মান ভুল্‌ব,
দীন দুঃখীদের ঠেল্‌ব না।

গায়ে খাট্‌ব, বন কাট্‌ব,
মাথা গুঁজে বসে থাক্‌ব না।

মাটি খুঁড়্‌ব, চাষ জুড়্‌ব,
কভু শ্রমে হেলা কর্‌ব না।

ভালবাস্‌ব, দুঃখ নাশ্‌ব,
কভু ছোট বড় বাছ্‌ব না।

পেয়ে লক্ষ, হয়ে যক্ষ—
তবু গরীবদের ভুল্‌ব না।

—গুরুসদয় দত্ত



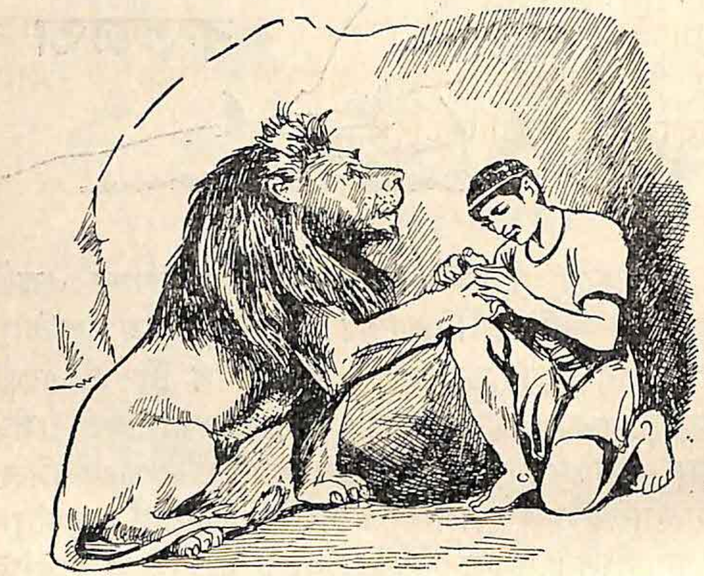
হিংস্র পশুর কৃতজ্ঞতা

একসময়ে রোমনগরের এক রাজপুরুষের একটি ক্রীতদাস পালিয়ে গিয়েছিল। কোন গ্রামে লুকিয়ে থাকলে ধরা পড়ার ভয় ছিল। এজন্য সে নির্জন একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ দেখা গেল, সেই গুহায় একদিন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে এক সিংহ এসে হাজির হল। সিংহকে দেখে ক্রীতদাসটি প্রথমটায় বড় ভয় পেল। কিন্তু দেখলে সিংহটি তার কোন অনিষ্টই করছে না। সে শুধু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার পায়ে বেশ বড় গোছের একটা কাঁটা বিঁধেছে। তাতে তার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। সিংহ আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তার সেই পা-টি ক্রীতদাসের কোলের ওপর তুলে দিলে। পলাতক ক্রীতদাস সিংহের ইঙ্গিত বুঝল। সে সিংহের পা থেকে কাঁটাটি বার করে দিলে। সিংহ তাতে বড়ই আরাম পেল। তারপর সিংহ চলে গেল।

দিন যায়। একদিন এই ক্রীতদাসটি ধরা পড়ল।

যখনকার কথা, তখন রোমে পলাতক ক্রীতদাসের শাস্তি ছিল নিদারুণ। পলাতক ক্রীতদাসদের ক্ষুধিত



সিংহের খাঁচার ভিতর ফেলে দেওয়া হত। সিংহ তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত।

এই ক্রীতদাসটিকেও সেই শাস্তি দেওয়া হল। তাকে একদিন একটি ক্ষুধার্ত সিংহের খাঁচার মধ্যে ফেলে দেওয়া হল। ভাগ্যক্রমে, যে সিংহের কথা আগে বলা হয়েছে, সেই সিংহের খাঁচাতেই ক্রীতদাসটিকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন আগে রাজার লোকেরা বন থেকে এই সিংহটিকে ধরে এনেছিল।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! সিংহ তার উপকারীকে চিনতে পেরে, তার পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

ব্যাপার দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা যখন প্রকাশ পেল, তখন ক্রীতদাসের প্রভু তাঁর ক্রীতদাসকে ক্ষমা করলেন। সিংহটিই তার উপকারীর প্রাণ বাঁচিয়ে দিল।

—কবিশেখর কালিদাস রায়

অনুশীলনী

১। বনের সিংহ পলাতক ক্রীতদাসের কোন অনিষ্ট না করে তার কোলের ওপর নিজের পা-টি তুলে দিয়েছিল কেন?

২। প্রাচীনকালে রোমনগরীতে পলাতক ক্রীতদাসদের কিভাবে শাস্তি দেওয়া হত?

৩। ক্রীতদাসটিকে সিংহের খাঁচার মধ্যে ফেলে দিলে পর সিংহ কি করেছিল তা বল।

৪। কি কারণে সিংহটি ক্রীতদাসটির কোন অনিষ্ট করেনি?



বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব

অনেকদিন আগেকার কথা। এক পল্লীগ্রামের রেল-স্টেশনে একটি ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নামলেন। তাঁর সঙ্গে একটি ছোট বাক্স ছিল। বাক্সটি হাতে করে বয়ে নিয়ে যেতে ভদ্রলোকটির বড়ই লজ্জা করছিল। তাই তিনি কুলির জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি 'কুলি', 'কুলি' বলে ডাকতে লাগলেন। সাদাসিধে ধুতিচাদর-পরা এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,—"এখানে কি কুলি মেলে না?"

সেই ব্যক্তি ভদ্রলোকটির বেশভূষা লক্ষ্য করলেন এবং বুঝলেন যে বাক্সটি বয়ে নিয়ে যেতে তিনি অপমান বোধ করছেন। তিনি বললেন,—"বাক্সটি আমার হাতে দিতে পারেন। আমি নিয়ে যেতে পারি।"

ভদ্রলোকটি তো নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বাক্সটি সেই ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়ে হন্ হন্ করে চললেন। সেই ব্যক্তি মাথায় বাক্স নিয়ে

ভদ্রলোকটির পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। স্টেশনের কাছেই ভদ্রলোকটির বাড়ী। বাড়ী পৌঁছে তিনি বাক্স



নিয়ে সেই ব্যক্তিকে একটি আনি দিতে গেলেন। "থাক্, দরকার নেই" বলেই আনি না নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলেন। ভদ্রলোকটি বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, লোকটি পয়সা নিলে না কেন?

তিনি বাড়ীর লোকের কাছে শুনলেন, গ্রামে বিদ্যাসাগর মশায় এসেছেন। বিদ্যালয়ে সভা হবে ও সেখানে তিনি বক্তৃতা করবেন।

ভদ্রলোকটি সেকথা শুনে মহা উৎসাহে বলে ফেললেন, "বিদ্যাসাগর মশায়কে দেখতেই আমি এখানে এসেছি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে পরম দয়ালু, বিদ্বান ও মহৎ ব্যক্তি সেকথা লোকের মুখে শুনেছি, তাঁকে কখনও দেখিনি।"

সভা আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ আগে ভদ্রলোকটি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলেন। ঠিক সময়ে বিদ্যাসাগর মশায় আসলেন। তিনি আসতেই সকলে উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোকটি তাকিয়ে দেখলেন—এ কে! ইনিই কি বিদ্যাসাগর? ইনিই তো সেদিন স্টেশন থেকে আমার বাক্সটি মাথায় করে আমাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন! কি লজ্জার কথা!

ভদ্রলোক তখন বুঝলেন, বিদ্যাসাগর মশায় মহৎ কেন। যে ছোট বাক্সটি হাতে করে আনতে তিনি লজ্জাবোধ করছিলেন, বিদ্যাসাগর তা মাথায় করে বহন করেছেন!

অনুশীলনী

১। বিদ্যাসাগর মশায়ের মহত্ত্ব সম্বন্ধে যে গল্পটি পড়লে তা সংক্ষেপে বল।

২। বিদ্যাসাগর মশায়ের ব্যবহারে ভদ্রলোকটির কিরূপ শিক্ষা হয়েছিল?

৩। তোমরা এই কাহিনী থেকে কি শিখলে?



আচ্ছা বিপদ

বন্ধু দু'জন আসছে ফিরে শিকার ক'রে শেষ,
মস্ত তারা শিকারী বীর, ভয়ের নাহি লেশ।

মাঠ পেরিয়ে যেমনি তারা বনের ধারে যায়,
পিছনে কার ফোঁস্-ফোঁসানি শুন্‌তে হঠাৎ পায়।

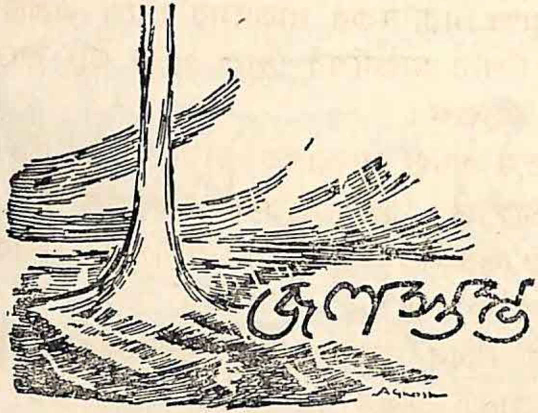
পিছন ফিরে তাকায় যেমন, শুকায় তাদের মুখ,
থর্‌থরিয়ে উঠ্‌ল কেঁপে শিকারীদের বুক!

ষণ্ডা সে এক গণ্ডারেরই বিরাট বপুখান,
আসছে তেড়ে ঠিক পিছনেই, অল্প ব্যবধান।

পাহাড় যেন আসছে ছুটে ভীষণ কদাকার,
পালাও, পালাও প্রাণটি নিয়ে, রক্ষা নাহি আর!

অনুশীলনী

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।
২। শিকারী দুজন ভয় পেল কেন?



তোমরা বড় বড় বাড়ীর থাম দেখে থাকবে। থামকে ভাল কথায় বলে স্তম্ভ। কোন কোন সময় সমুদ্রের জলের উপরে জলের স্তম্ভ দেখা যায়। তাকে জলস্তম্ভ বলে। জল থেকে তার উৎপত্তি।

পৃথিবীর সর্বত্রই বাতাস রয়েছে। এই বাতাস রোদে তেতে গরম হলে হাল্কা হয়। হাল্কা বাতাস উপরে ওঠে। তার শূন্য জায়গাটা তৎক্ষণাৎ দখল করে আশপাশের ঠাণ্ডা বাতাস। বাতাসের এই ঠেলাঠেলিতে ঘূর্ণিবায়ুর স্বষ্টি হয়। অর্থাৎ, সেখানকার বাতাস ঘুরপাক খায়।

এই ঘূর্ণিবাতাস আবার এক জায়গায় স্থির থাকে না। তা চলতে চলতে সমুদ্রের উপর দিয়ে গেলে সমুদ্রের জল তোলপাড় করতে থাকে এবং তার আশপাশের ঢেউ-গুলি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সেখানে এসে পড়ে। কাজেই

সেখানে অনেক জল ও বাষ্প জমা হয়। সেই জল এবং জলীয় বাষ্প চারদিকের বাতাসের চাপে একটি থামের আকারে উপরে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে ওঠে। এই হল জলস্তম্ভ।

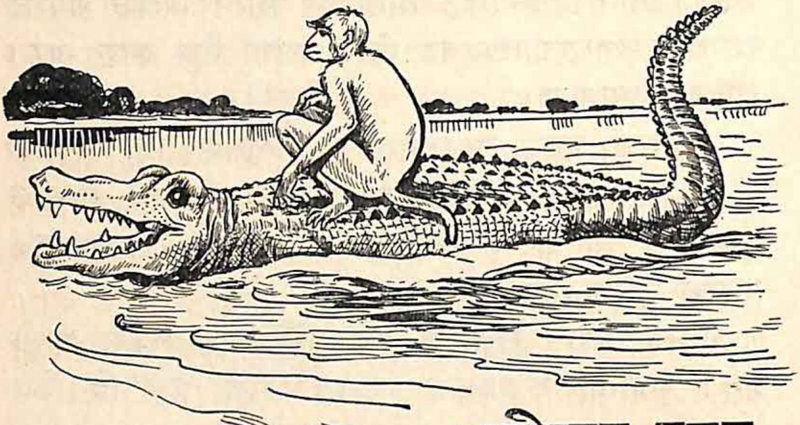
জলস্তম্ভ সাড়ে সতেরশত হাত পর্যন্ত উঁচু হতেও দেখা গিয়েছে। এর ভিতরটা কিন্তু ফাঁপা। দেখতে হাতীর শুঁড়ের মত। যেদিকে বাতাস বয় জলস্তম্ভ সেই দিকেই ঝুঁকে পড়ে।

কোন কোন জলস্তম্ভ এক ঘণ্টাকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। কোনটি অল্পক্ষণের ভেতর হেলে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। জলস্তম্ভ যেখানে ভেঙে পড়ে সেখানকার ঘরবাড়ী, গাছপালা নষ্ট হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ারে একটি জলস্তম্ভ যেখানে ভেঙে পড়েছিল, সেখানে সাড়ে সতেরশত হাত দীর্ঘ এক গর্ত হয়েছিল।

মরুভূমির বালুকাও কখনও কখনও হাতীর শুঁড়ের মত আকার নিয়ে ঠেলে আকাশের দিকে ওঠে। তাকে বালুকাস্তম্ভ বলে।

অনুশীলনী

জলস্তম্ভ কি? কিভাবে এর উৎপত্তি হয়?



কুমীরের বন্ধুত্ব

নদীর ধারে একটি জামগাছ। জামগাছে থাকে এক বানর। সে মনের খুশিতে গাছে লেজ ঝুলিয়ে বসে থাকে। যখন খিদে পায়, তখন ঐ গাছ থেকে পাকা পাকা জাম খায়।

ঐ নদীতে এক কুমীর ছিল। তার সঙ্গে বানরের খুব ভাব। কুমীর রোজ জল থেকে উঠে আসে ডাঙায়। জামগাছ-তলায় রোদ পোহায়। বানর গাছ থেকে দু-একটি জাম ফেলে দেয় নীচে। কুমীর তাই খেয়ে বলে, বাঃ কি মিষ্টি জাম!"

একদিন কুমীর খুব খুশী হয়ে বললে, "ভাই বানর, আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু।"

বানর বললে,—"এ তো সুখের কথা!"

আর একদিন কুমীর বললে, “ভাই বানর, আজ জাম কিছু বেশী করে দিও। আমার বৌ জাম খেতে চেয়েছে।”

বানর বললে, “এ আর বেশী কথা কি! এবার থেকে রোজ তোমার বৌয়ের জন্য জাম নিয়ে যেও।”

কুমীরের বৌ রসে-ভরা পাকা পাকা জাম খেয়ে ত’ খুব খুশী। সে একদিন কুমীরকে বললে, “এমন মিষ্টি ফল তো কখনও খাইনি!” কিন্তু নিজের মনে মনে বললে, যে বানর রোজ এমন মিষ্টি ফল পেট ভরে খায়, তার কলজেটা না-জানি কত মিষ্টি! কুমীরের বৌয়ের মনের কথা মনেই থাকে।

একদিন বানর কুমীরকে বললে, “বন্ধু, আজ আমার মন বড় খারাপ।”

“কেন ভাই, কি হয়েছে?”

বানর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে, “গাছের জাম সব ফুরিয়ে এল—এখন কি উপায় হবে?”

কুমীর বললে, “তাইত ভাই, এ যে ভারী দুঃসংবাদ।”

কুমীর বাড়ী গিয়ে তার বৌকে বললে, “আজ আর জাম আনতে পারিনি। গাছে আর জাম নেই, বানরও চলে যাচ্ছে।”

কুমীরের বৌ কিন্তু বানরের কলিজার কথা ভোলেনি। সে কুমীরকে বললে, “জাম যখন আর পাওয়াই যাবে না—তখন এক কাজ করো। বানরকে নিয়ে এস, আমি তার কলজে খাব।”

কুমীর বললে, “সে কি! সে যে আমার বন্ধু।”

কুমীর-বৌ বললে, "তুমিও যেমন! সে থাকে ডাঙায় আর আমরা থাকি জলে। ডাঙার জীবের সঙ্গে কি জলের জীবের মিতালি হয়?"

কুমীর সেকথা শুনে বললে, "সে কি আসতে চাইবে?"

কুমীর-বৌ বললে, "বানরকে বলবে, 'বন্ধু, তুমি চলে যাচ্ছ শুনে তোমার মিতা-বৌ তোমায় একটিবার দেখতে চেয়েছে। এই কাছেই নদীর ওপারে আমাদের বাড়ী'।"

কুমীর কি আর করে।

পরদিন বানরের সঙ্গে কুমীরের দেখা হল। বানর বললে, "আমি তোমার জন্য বসে আছি।" কুমীর বললে, "কেন বন্ধু?"

বানর বললে, "অন্য এক বনে ফলের খোঁজ পেয়েছি। তাই যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বসে আছি।"

কুমীর বললে, "আমার জন্য অপেক্ষা করে ভালই করেছ। তুমি চলে যাচ্ছ শুনে তোমার মিতা-বৌ তোমায় যাবার জন্য অনেক করে বলে দিয়েছে। তোমার খাবার জন্য অনেক কিছু যোগাড় করে রেখেছে। তুমি না গেলে বেচারী মনে ভারী দুঃখ পাবে।"

বানর বললে, "সে কি করে হয়? আমি জলে যাব কি করে?"

কুমীর বললে, "না না, জলে তোমায় নামতে হবে কেন! আমাদের বাড়ী ঐ ও-পারে ডাঙায়। এপার থেকে আমার পিঠে চড়বে, আর ওপার গিয়ে নামবে"

সরল বানর কুমীরের কথা বিশ্বাস করে যেতে রাজী হল।

কুমীর বানরকে পিঠে নিয়ে রওনা হল। জলে পিঠ ভাসিয়ে চলতে লাগল। মাঝ-নদীতে কুমীরের বৌ লুকিয়ে ছিল। কুমীর সেখানে গিয়ে জলে ডুব দিল।

কুমীর তার বৌকে বললে, "ও কুমীর-বৌ, এই যে এনেছি, বানরের কলজে খাও।"

বানর হাবুডুবু খেতে খেতে কুমীরের কথা শুনে ত' অবাক! নিজের বিপদ বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে বলে উঠল, "বন্ধু, কলজের কথা তো আগে বলনি! আসার সময় কলজে যে আমি জামগাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে এসেছি। এ তো এক সামান্য জিনিস! আমায় ডাঙায় নিয়ে চল—জামগাছ থেকে কলজে পেড়ে তোমাকে দিয়ে দেবো। মিতা-বৌ খাবে এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা!"

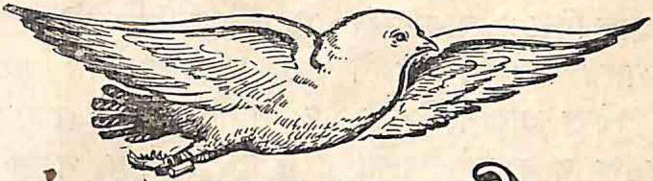
বোকা কুমীর সেকথা সত্যি বলে বিশ্বাস করলে। কুমীর তখন বানরকে ডাঙায় নিয়ে এল। বানর এক লাফে গাছে উঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কুমীর আর তার নাগাল পেল না।

অনুশীলনী

১। কুমীরের সঙ্গে বানরের কি করে বন্ধুত্ব হল ?
২। বানর অন্য জায়গায় চলে যেতে চেয়েছিল কেন ?
৩। কুমীরের বৌ বানরকে কি বলে তার কাছে নিয়ে আসতে বলেছিল ?
৪। বানর জলে হাবুডুবু খেতে খেতে কুমীরকে কি বলেছিল ?



"কাকাতুয়া, কাকাতুয়া, আমার জাদুমণি,
সোনার ঘড়ি কি বলিছে, বল দেখি শুনি।"
"বলিছে সোনার ঘড়ি, 'টিক্ টিক্ টিক্',
যা কিছু করিতে আছে, ক'রে ফেল ঠিক।
সময় চলিয়া যায়—
নদীর স্রোতের প্রায়,
যে জন না বুঝে, তারে ধিক্ শত ধিক্।
বলিছে সোনার ঘড়ি, 'টিক্ টিক্ টিক্'।"
"কাকাতুয়া, কাকাতুয়া, আমার জাদুধন,
অন্য কোন কথা ঘড়ি বলে কি কখন?"
"মাঝে মাঝে বলে ঘড়ি, 'টঙ্ টঙ্ টঙ্',
মানুষ হইয়া যেন হ'য়ো নাক' সঙ্।
ফিট্ফিটে বাবু হ'লে,
ভেবেছ কি লবে কোলে?
পলাশে কে ভালবাসে দেখে রাঙা রঙ্?
মাঝে মাঝে বলে ঘড়ি, 'টঙ্ টঙ্ টঙ্'।"



মানুষের জন্য জীবন দান

এই যে পায়রাটি আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, তার পায়ে ওটা কি বাঁধা? ওটা একটি চিঠি। যুদ্ধের জরুরী খবর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাবার জন্য পায়রাটিকে আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তার পায়ের চিঠিতে অনেক জরুরী খবর লেখা আছে। লেখা আছে যুদ্ধের অনেক গোপনীয় কথা। যেখানে চিঠিটা পৌঁছে দিতে হবে, পায়রার তা জানা আছে। সে ঠিক উড়ে গিয়ে চিঠিখানি জায়গা-মত পৌঁছে দেবে।

শত্রুপক্ষের এলাকা ও জানে। সেখানে ও কিছুতেই নামবে না,—পিপাসায় ছাতি ফেটে গেলেও না, খিদেয় কাতর হলেও না।

পায়রা একটা সামান্য প্রাণী, কিন্তু দেখ কত বড় কাজ সে করছে! এবার একটি পায়রার কথা শোন—যার আত্মদানের কথা শুনলে তোমরা অবাক হবে।

যুদ্ধ চলছে। খুব তাড়াতাড়ি একটা জরুরী খবর এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া দরকার। একটি পায়রার পায়ে একখানি চিঠি বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হল।

পথে শত্রুপক্ষ পায়রাটিকে ধরবার জন্য একটি বাজ-পাখী ছেড়ে দিল। বাজপাখী পায়রাটিকে কিছুতেই আর ধরতে পারে না। বাজপাখী যত ওড়ে পায়রাও তত ওড়ে। কিন্তু বাজপাখীর সঙ্গে পায়রা পারবে কেন? শেষ পর্যন্ত বাজপাখী পায়রার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাজপাখী পায়রাটিকে আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে রক্ত বার করে দিল। কিন্তু এত করেও বাজপাখী পায়রাটিকে ধরতে পারল না। বাজপাখীর আঁচড়-কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও পায়রা যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে চিঠিখানি পৌঁছে দিল।

তখন তার দেহের নানা জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে। তার সাদা পালক রক্তে ভিজে লাল হয়ে গিয়েছে। বেচারী থরথর করে কাঁপছে। বাজপাখীর ধারাল নখের আঘাতে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

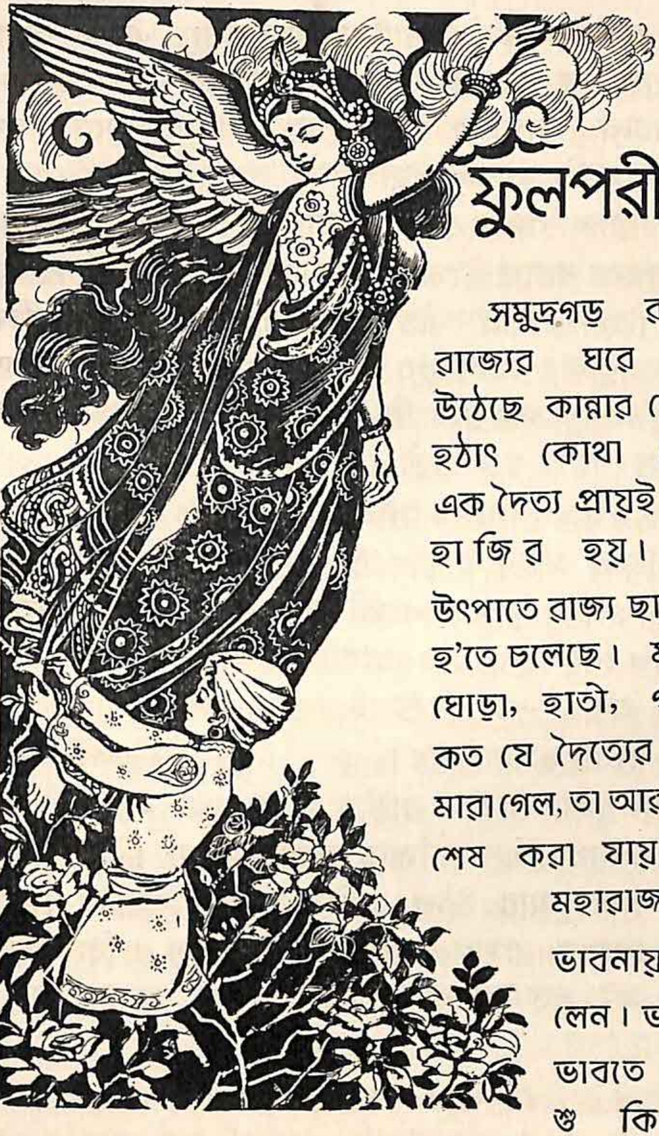
যে দলের পায়রা, সে দলের লোকেরা পায়রাটিকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই তাকে বাঁচাতে পারল না।

মানুষ মানুষের উপকার করতে গিয়ে জীবন দেয়, এমন মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু সামান্য পাখীও যে এ-ভাবে মানুষের উপকার করতে গিয়ে জীবন দিতে পারে, এটা খুব আশ্চর্য নয় কি?

অনুশীলনী

১। যুদ্ধের সময় পায়রা কি কাজে লাগে?

২। পত্রবাহক পায়রাকে ধরাবার জন্য শত্রুপক্ষ কি উপায় অবলম্বন করে?



ফুলপরী

সমুদ্রগড় রাজ্য। রাজ্যের ঘরে ঘরে উঠেছে কান্নার রোল। হঠাৎ কোথা থেকে এক দৈত্য প্রায়ই এসে হাজির হয়। তার উৎপাতে রাজ্য ছারখার হ'তে চলেছে। মানুষ, ঘোড়া, হাতী, গরু— কত যে দৈত্যের হাতে মারা গেল, তা আর বলে শেষ করা যায় না। মহারাজ বড় ভাবনায় পড়লেন। ভাবতে ভাবতে তিনি শুকিয়ে গেলেন। খাওয়া-দাওয়া তাঁর বন্ধ হল।

একদিন তিনি একা বসে আছেন। এমন সময় ছোটরাজপুত্র রতনকুমার এসে হাজির। সে বললে—"মহারাজ, আপনার কি হয়েছে? বিষণ্ণ মনে একা একা বসে কি এত ভাবছেন?"

মহারাজ তখন রতনকুমারকে সব কথা বললেন। রতনকুমার বললে—"মহারাজ, এর জন্য আপনি ভাববেন না। যে করেই হোক দৈত্যকে আমি মারবো।"

রতনকুমার ছিল খুব সাহসী। সে সেদিনই তীর-ধনুক আর তরোয়াল নিয়ে, তার সাদা ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়ল রাজবাড়ী থেকে। চলতে চলতে এসে হাজির হল এক গভীর বনে।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল। রাজকুমার বনে ঘুরতে ঘুরতে দেখে সামনে একটি মস্ত বাড়ী। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। বাড়ীর প্রধান দরজাটি হাতীর দাঁতের। দরজা বন্ধ। এটা নিশ্চয়ই কোন রাজার বাড়ী। কি করে ভেতরে যাওয়া যায়!

রতনকুমার দেখলে বাড়ীর পাশে মস্ত একটি গাছ। গাছটির মাথা গিয়ে ঠেকেছে বাড়ীটির ছাদে। সেই গাছ বেয়ে রতনকুমার উঠল বাড়ীর ছাদে। বাড়ীর ভেতর ঢুকে দেখলে, কোন লোক নেই। সারা বাড়ীতে সারি সারি সব পাথরের মূর্তি। রতনকুমার ঘুরতে ঘুরতে বাগানে গেল।

তখন রাত হয়েছে। জ্যোৎস্না রাত। চাঁদের আলোয় বাগানটি যেন হাসছে। হঠাৎ রতনকুমার দেখলে একটি

পরী সেখানে গাছে গাছে ফুলের কুঁড়ি ছুঁয়ে যাচ্ছে। তার ছোঁয়া লেগে কুঁড়িগুলি পাপড়ি মেলে ফুল হয়ে ফুটে উঠছে।

পরীর পরনে সোনার জরির বুটিদার নীল শাড়ী। তার মাথায় সোনার মুকুট। পায়ে সোনার মল। হাতে দুগাছি রুলি। গলায় হার। ডানা দুটিতে রকমারি রং। আর পরীর গায়ের রং? সে যেন কাঁচা সোনার মত। তার রূপে বাগান আলো হয়ে উঠেছে।

রাজকুমার পরীর রূপের ছটা, আর তার ফুল ফোটানো দেখছিল। এমনি সময়ে হঠাৎ রাজকুমারকে দেখে পরী পালাতে গেল। পালাতে গিয়ে পরীর শাড়ীর আঁচল একটি গোলাপ গাছের ডালের কাঁটায় আটকে গেল। সে বেচারী কাঁটা থেকে আঁচল ছাড়াবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কাঁটা আর ছাড়ে না।

বহু চেষ্টাতেও পরী যখন কাঁটা থেকে তার কাপড় ছাড়াতে পারলে না, তখন রাজকুমার থাকতে পারলে না। সে ছুটে গিয়ে গোলাপ কাঁটা থেকে পরীর কাপড় ছাড়িয়ে দিলে। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করলে—"কে তুমি?" পরী বললে—"আমি ফুলপরী। বাগানে গাছের ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফুল ফোটাই।—কিন্তু তুমি কে? আর এখানেই বা কেন এলে? পালাও এখুনি—দৈত্য এল বলে। তোমাকে দেখলেই মেরে ফেলবে।" রতনকুমার বললে—"ভয় কাকে বলে আমি জানি না। দৈত্য যদি আসে, তীর মেরে বধ করবো তাকে।"

রতনকুমারের কথা শুনে ফুলপরী বললে—"এ যে-সে দৈত্য নয়, জাদুও জানে। দেখ কত মূর্তি সারা রাজপ্রাসাদে। দৈত্য মন্ত্রবলে এদের পাথর করে রেখেছে।"

রতনকুমার বললে—"এ দৈত্যকে বধ না করে আমি কিছুতেই যাবো না।"

সে-কথা শুনে ফুলপরী বললে—"তবে তুমি ঐ গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকো। দৈত্য এসেই সব মূর্তিকে আবার মানুষ করে দেবে। তখন তুমি তাদের দলে ভিড়ে গিয়ে দৈত্যকে মেরো।"

ফুলপরীর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দুম দুম করে পা ফেলে দৈত্য এসে হাজির। কি বিরাট তার চেহারা! হাতীর মত মাথা, মূলোর মত বড় বড় দাঁত। তালগাছের মত বড় বড় পা। দৈত্য এসেই পাথরের মূর্তিগুলোকে মানুষ করে দিল। রতনকুমার ও ফুলপরী অমনি লুকিয়ে পড়ল।

ফুলপরী তখন রতনকুমারকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকল। রতনকুমার দেখলে—দৈত্য সোনার সিংহাসনে বসে। লোকজনরা কেউ তাকে বাতাস করছে, কেউবা হাত টিপছে, কেউ বা পা টিপছে।

দৈত্য মহা আরামে হাই-তুলে চোখ বুজল। ফুলপরী তার মাথার খোঁপা থেকে একটা গোলাপ ফুল রতন-কুমারের হাতে দিল। বললে—"এই ফুলটা তীরের আগায় বিঁধিয়ে দৈত্যের কপালে ছুঁড়ে মারো।"

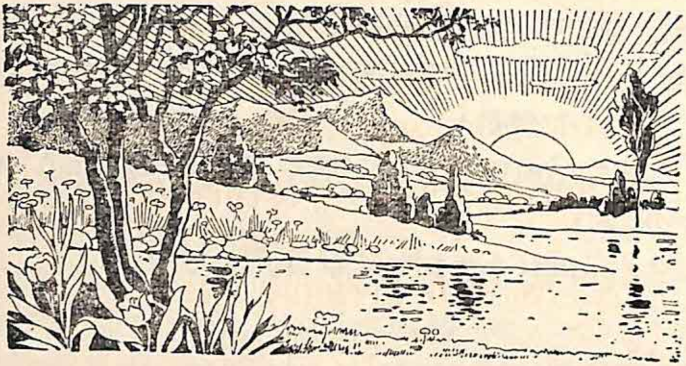
রতনকুমার তখনই পরীর কথামত তীর ছুঁড়ল। অমনি অবাক কাণ্ড! তীরটা দৈত্যের কপালে লাগতেই দৈত্য এক বিকট চিৎকার করে উঠল। আর তার মাথাটা খসে পড়ল।

তারপর দৈত্যের মাথা নিয়ে রতনকুমার ফিরে এল সমুদ্রগড়ে।

সারা রাজ্যে শুরু হয়ে গেল মহা ধুমধাম।

অনুশীলনী

১। সমুদ্রগড় রাজ্যে কান্নার রোল উঠত কেন?
২। রতনকুমার বনে কি দেখেছিল?
৩। পরী বাগানে রতনকুমারকে কি বলেছিল?
৪। রতনকুমার কি করে দৈত্যকে মেরেছিল?



ভোরের গান

ভোরের আকাশ লাল হয়েছে,
আঁধার গেল দূরে ;
মধুর হাসি হাসছে ঊষা
পূবের আকাশ জুড়ে' ।

উঠ্‌ছে জেগে উজল রবি
সোনার ছবি যেন,
খোকাখুকু, এখন তোরা
ঘুমাস্ প'ড়ে কেন ?

জাগলো পাখী গাছের ডালে,
গান ধরেছে তারা ;
দিকে দিকে পড়্‌লো রে আজ
জাগরণের সাড়া !

কানন জুড়ে হাজার ফুলের
বাজার যেন শোভে,
ভিড় করেছে মৌমাছিরা
মধুর লোভে লোভে।

ভোর হোলো রে দোর খোলে রে,
ও ভাই খোকাখুকী,
তোদের দোরে ভোরের আলো
মার্‌ছে উঁকিঝুঁকি।

আয় রে সবাই খেল্‌বি যদি
মধুর সকাল বেলা,
পড়ার সময় পড়বি রে ভাই,
খেলার সময় খেলা।

(সংক্ষেপিত)

—সুনির্মল বসু

অনুশীলনী

১। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। কবিতাটি পড়ে কি উপদেশ পেলে ?



মহাকবি কালিদাসের নাম কে না জানে! তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি।

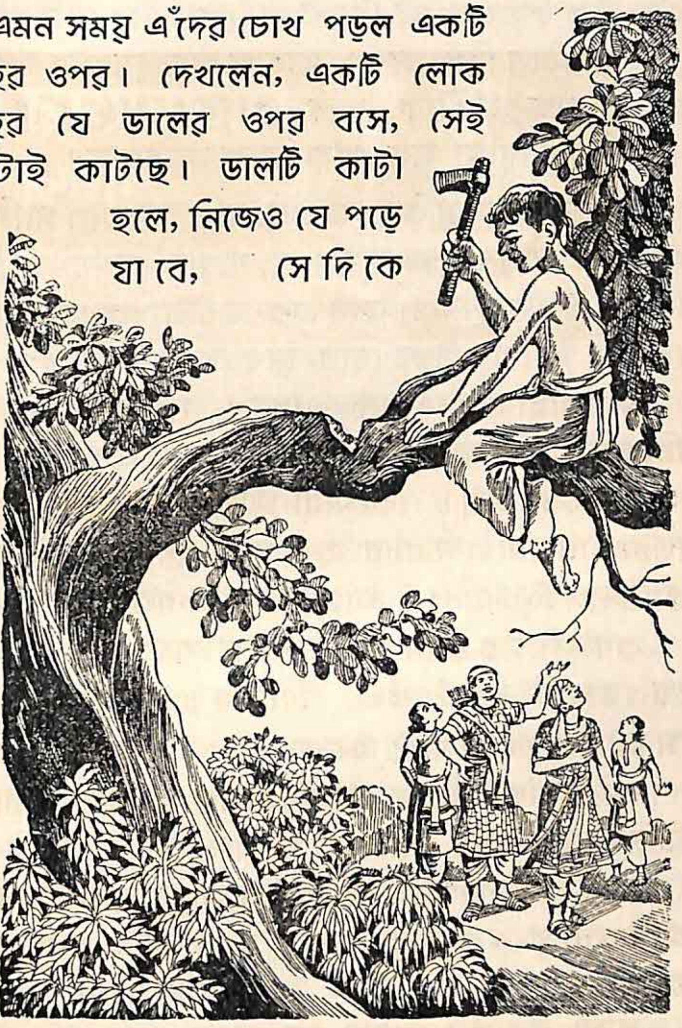
সে যুগের সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নয়জন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁদের বলা হত নবরত্ন। মহাকবি কালিদাস ছিলেন সেই নবরত্নের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।

কালিদাসের প্রথম জীবন সম্বন্ধে শোনা যায় যে, তিনি নাকি ছিলেন খুব বোকা। তিনি যে রাজ্যে বাস করতেন সে রাজ্যের রাজকুমারী ছিলেন ভীষণ অহঙ্কারী। তিনি পণ করেছিলেন, যিনি তাঁকে তর্কযুদ্ধে হারাতে পারবেন, তিনি তাঁকেই বিয়ে করবেন।

কত রাজা-রাজড়া, কত বড় বড় পণ্ডিত রোজই আসছেন, আর তর্কযুদ্ধে হেরে মাথা হেঁট করে ফিরে যাচ্ছেন।

একদিন তর্কে পরাজিত কয়েকজন লোক পথ দিয়ে চলেছেন, আর ভাবছেন—"রাজকুমারীর বড় অহঙ্কার! কি করে তাঁকে জব্দ করা যায়?"

এমন সময় এঁদের চোখ পড়ল একটি গাছের ওপর। দেখলেন, একটি লোক গাছের যে ডালের ওপর বসে, সেই ডালটাই কাটছে। ডালটি কাটা হলে, নিজেও যে পড়ে যাবে, সে দিকে



লোকটির কিছুমাত্র খেয়াল নেই। লোকটিকে এইভাবে গাছ কাটতে দেখে, এঁদের মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল।

এঁরা ঠিক করলেন এই নিরেট মূর্খ লোকটার সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দিতে হবে। তাহলে রাজকুমারীর দর্প চূর্ণ হবে। রাজকুমারীকে জব্দ করবার জন্য এঁরা এই লোকটিকে গাছের ডাল থেকে ডেকে নামালেন।

তারপর তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পণ্ডিতের বেশে সাজিয়ে, উপস্থিত হলেন রাজসভায়। যাবার সময় শিখিয়ে দিলেন, "রাজকুমারী কোন প্রশ্ন করলে কেবল আঙুল দেখিয়ে ইশারায় উত্তর দেবে, মুখে কোন উত্তর দিও না।"

রাজবাড়ীতে তর্কের সভা বসল। সভার মাঝে একদিকে এই লোকটি চুপচাপ বসে আছে। অন্যদিকে বসে আছেন রাজকন্যা। রাজকন্যা আঙুল তুলে প্রশ্ন করতেই লোকটি কোন কথা না বলে, পরামর্শ-মত আঙুল দেখিয়ে ইশারায় উত্তর দিল। তারপর অপমানিত লোক কয়জন এক জোটে তার নানান রকম ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করলেন যে লোকটি ঠিকই উত্তর দিয়েছে। রাজকন্যা রাজী হলেন লোকটিকে বিয়ে করতে।

এই যে লোকটির কথা বলা হলো, যার সঙ্গে কৌশলে রাজকন্যার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, ইনিই কালিদাস। বিয়ের রাতে কালিদাসকে দেখে রাজকন্যার কিন্তু সন্দেহ হতে লাগল, লোকটা বোধ হয় বোকা। এমন সময় রাজবাড়ীর বাইরে একটা উট ডেকে ওঠায় রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করলেন, "ওটা কি জন্তুর ডাক?" উটকে সাধুভাষায় বলে 'উষ্ট্র'। কালিদাস ত' ছিলেন মূর্খ। কাজেই তিনি উচ্চারণ করতে না পেরে বললেন, 'উট্‌ট্র'।

শুনে রাজকুমারী তখনই বুঝলেন তাঁর সঙ্গে যাঁর বিয়ে হয়েছে, তিনি এক মহামূর্খ। রাগে দুঃখে রাজকুমারী তখনই যুবককে অপমান করে ঘর থেকে বার করে দিলেন। স্ত্রীর কাছে অপমানিত হয়ে কালিদাসের মনে খুব দুঃখ হলো। তিনি জলে ডুবে মরবেন ঠিক করে, বনের মধ্যে এক পুকুরে নামতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু হঠাৎ দেবী সরস্বতী সেখানে এসে তাঁকে বর দিয়ে গেলেন যে, তিনি খুব বড় পণ্ডিত হবেন।

এর পর শুরু হলো কালিদাসের জ্ঞানলাভের জন্য অতি কঠোর সাধনা। দেখতে দেখতে কিছুদিনের মধ্যে মূর্খ যুবক কালিদাস হয়ে উঠলেন সে যুগের এক মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। সমস্ত শাস্ত্র পাঠ শেষ করে কালিদাস কাব্য রচনা শুরু করলেন। তাঁর রচিত কাব্যগুলির নাম—মেঘদূত, ঋতুসংহার, রঘুবংশ আর কুমারসম্ভব। শকুন্তলা তাঁর একটি বিখ্যাত নাটক। এই সমস্ত গ্রন্থ তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। তাঁর রচিত নাটক ও কাব্যগুলি আজও অমর হয়ে আছে।

অনুশীলনী

১। নবরত্ন সভা কোন্ রাজার ছিল ? নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন কে ?

২। কালিদাস কিভাবে বড় কবি হলেন ?

৩। কালিদাস সম্বন্ধে যা জান বল।



[রাজার সভা। কীট-পতঙ্গের রাজা,—সভায় এসে তিনি রোজ সিংহাসনে বসে পোকা-মাকড়দের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন। সভায় পিঁপড়ে, প্রজাপতি, ফড়িং, আরশুলা, মৌমাছি, গুবরে পোকা, শুঁয়োপোকা—এমনি সব নানারকম কীট-পতঙ্গ আসে বিচারের আশায়। রাজা তাদের বিচার করেন। রাজার বিচারে খুশী হয়ে তারা বিদায় নেয়। যদি কেউ কীট-পতঙ্গের অনিষ্ট করে, তাদের উপর পীড়ন করে, রাজার সভায় তারই বিচার হয়।]

সেদিন কীট-পতঙ্গের রাজার সভা বসেছে। বিচার হবে একটি ছোট্ট ছেলের। ছেলেটি পিঁপড়ে, প্রজাপতি, মৌমাছির ওপর বড় অত্যাচার করে। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পিঁপড়ে, প্রজাপতি আর মৌমাছির রাণীরা তার নামে রাজার কাছে নালিশ করেছে।

রাজা বিচারের জন্য সিংহাসনে বসেছেন। ছেলেটিকে ধরে আনা হয়েছে।

রাজা—আজকের অপরাধী কে ?

প্রহরী—মহারাজ! এই ছোট্ট ছেলেটি আজকের আসামী।

রাজা—ছেলেটির অপরাধ কি? কে ওর নামে নালিশ করেছে?

প্রহরী—ছেলেটির অপরাধ এই যে, এ ছেলে পিঁপড়ে, প্রজাপতি আর মৌমাছিদের ওপর বড়ই অত্যাচার করে।

রাজা—বেশ। তাহলে পিঁপড়ের রাণীকে ডাক। তার নালিশ শোনা যাক।

পিঁপড়ের রাণী—মহারাজ! এই ছেলেটি আমাদের দেখলেই মারতে ছোটে। কত পিঁপড়ে যে এ ছেলের হাতে প্রাণ হারিয়েছে, তার সীমাসংখ্যা নেই।

রাজা—বালক! তোমার কিছু বলবার আছে?

বালক—মহারাজ! এই পিঁপড়েরা বড় দুষ্টু। রোজ এরা দল বেঁধে আমার চিনিটুকু খেয়ে নেয়, রসগোল্লার রসটুকু শুষে নেয়। তাছাড়া সুবিধা পেলেই দেয় কুটুস্ করে কামড়। ছোটগুলোর কামড়ে বড্ড জ্বালা করে। বড় ডেঁয়েগুলোর কামড়ে,—বলব কি রাজামশাই! রক্ত বেরিয়ে যায়। মানুষের কোন কাজে লাগে না এরা। কোন উপকারই হয় না এদের দিয়ে। এদের মারব না ত' কি!

রাজা—মানুষের উপকার এই পিঁপড়েরা করে না, একথা মানতে রাজী নই। মরা পোকা-মাকড়, পশু-পাখী কোথাও পড়ে থাকলে পিঁপড়েরা সেই সব পোকা-মাকড়, পশু-পাখী খেয়ে ফেলে। এরা দল বেঁধে ছোট ছোট মরা

পোকা-মাকড় মুখে করে টেনে নিজেদের বাসায় নিয়ে যায়। তারই ফলে তোমাদের ঘরদুয়ার পরিষ্কার হয়।

বালক—মহারাজ! আমার জানা ছিল না পিঁপড়ে ছোট্ট প্রাণী হলেও মানুষের উপকার করে। এর পর আর কখনো আমি পিঁপড়েদের ওপর অত্যাচার করব না।

রাজা—আচ্ছা, এবার প্রজাপতির রাণীকে ডাক।

প্রজাপতির রাণী—মহারাজ! এই ছেলেটি আমাদের ওপর বড় অত্যাচার করে। বাগানে যখন আমরা ফুলে ফুলে বসি, তখন আমাদের ধরবার জন্য ছুটোছুটি করে। দলের দু'চারটিকে ধরে রোজ এর খেলা করা চাই। ফলে আমাদের হয় প্রাণান্ত।

রাজা—বালক! তোমার কিছু বলবার আছে?

বালক—মহারাজ! পিঁপড়েরা উপকারী প্রাণী মেনেছি। কিন্তু এই প্রজাপতিরা একেবারে অপদার্থ,—কোন গুণ নেই এদের। কেবল রং আর রূপেরই বাহার আছে। তাই এদের ধরে ধরে খেলা করি।

রাজা—এ তোমার ভুল ধারণা। প্রজাপতিরা কেবল রূপেই তোমাদের ভুলোয় না। তোমাদের অনেক কাজ, অনেক উপকার এরা করে দেয়। তোমরা রেশমের জামা পর। সে রেশম কি করে হয় জান? ডানা গজাবার ঠিক আগে প্রজাপতির বাচ্চা পোকারা ছোট ছোট একরকম গুটির ভেতর থাকে। সেই গুটি গরম জলে দিলে একরকম আঁশ বার হয়। সেই আঁশই রেশম। তাছাড়া, প্রজাপতি যখন মধু খেতে এ-ফুল থেকে ও-ফুলে

উড়ে গিয়ে বসে, তখন এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে প্রজাপতির পায়ে পায়ে চলে যায়। এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে না গেলে কিন্তু ফুল হতে ফল হয় না। তাহলে দেখ ত' প্রজাপতি তোমাদের উপকার করে কিনা ?

বালক—মহারাজ ! প্রজাপতিরা যে সত্যিই মানুষের এত উপকার করে, আজ তা জানলাম। আর কখনো আমি এই উপকারী প্রাণীটির ওপর অত্যাচার করব না—কথা দিচ্ছি। কিন্তু মহারাজ ! মৌমাছিগুলো বড় বেয়াদব। সুবিধা পেলেই হুল ফুটিয়ে শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

রাজা—মৌমাছিরা হুল ফুটোয় বটে। কিন্তু সব সময়ে অকারণে কি ? মৌমাছির হুল ওদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। তোমরা ওদের মারতে গেলে, তবেই ওরা হুল ফুটোয়। তাছাড়া, মৌমাছির উপকারের কথা ভুলে গেলে ত' চলবে না। তোমরা মধু খাও। মধু পুষ্টিকর জিনিস,—কেমন মিষ্টি ! ছোট শিশুদের পুষ্টির জন্য মধু খাওয়ান হয়। ওষুধ তৈরি করার জন্য মধুর দরকার হয়। মৌমাছিরা ফুলে ফুলে বসে এই মধু সংগ্রহ করে এনে মৌচাকে রাখে। সেই মৌচাক থেকে তোমরা একদিকে পাও মধু, আর একদিকে পাও মোম। সেই মোম দিয়ে বাতি তৈরী হয়। সুতরাং দেখতে পাচ্ছ ত' এরাও মানুষের কত উপকার করে !

বালক—প্রতিজ্ঞা করছি মহারাজ ! আর কোনদিন পিঁপড়ে, প্রজাপতি, মৌমাছির ওপর অত্যাচার করব না।

দেখছি এরা ছোট প্রাণী হলেও কোন-না-কোন রকমে মানুষের উপকার করছে।

রাজা—তোমায় এবারকার মত মাপ করা গেল। কারণ, না জেনে তুমি অপরাধ করেছ। কিন্তু আর কখনো এমন কাজ কোরো না, বুঝলে!

বালক—যে আজ্ঞা মহারাজ!

অনুশীলনী

১। রাজসভায় কে কে ছিল?

২। পিঁপড়ে কেন নালিশ করেছিল?

৩। মৌমাছি থেকে কি উপকার পাওয়া যায়?



পারিব না

অলস অবোধ

'পারিব না' এ-কথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবে না, তাহা ভাব একবার।
পাঁচজনে পারে যাহা,
তুমিও পারিবে তাহা,
পার কি না পার কর যতন আবার,
একবারে না পারিলে দেখ শতবার।

'পারিব না' বলে মুখ করিও না ভার,
ও-কথাটি মুখে যেন শুনি না তোমার।
অলস অবোধ যারা,
কিছুই পারে না তারা,
তোমায় তো দেখি না'কো তাদের আকার,
তবে কেন 'পারিব না' বল বার বার?